নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

সংখ্যা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

আদিবাসী শব্দ ও মানবাধিকারের বিস্তর লগন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য এবং সহিংসতার প্রতিরূপ

সূচিপত্র

নাগরিক উদ্যোগ
সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ: ১১ সংখ্যা: ৩য়, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২২

সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ
জাকির হোসেন
মোসাম্মৎ লাকী আক্তার
শান্তা ইসলাম
সুলতান মো: সালাউদ্দিন সিদ্দিক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
নুসরাত আলম পৃথা

আলোকচিত্র
নাগরিক উদ্যোগ ও ইন্টারনেট

প্রকাশনা
সম্পাদনা কর্তৃক ৮/১৪, ব্লক-বি
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রণ
প্রকাশক কর্তৃক ডি. এস. পেইন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৩৪/ ডি, নিউ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৪০ টাকা

যোগাযোগ
ফোন : ৪৮১২২৮২৯, ফ্যাক্স : ৪৮১২১৪৫৫
মোবাইল : ০১৭১৩১৩১৩৪৮
ই-মেইল : nuddyog@gmail.com

সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও নারীদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়নে করনীয়

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং নারীর অধিকার, বঞ্চনা ও নিরাপত্তা বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত। সেই সাথে সহিংসতার মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। দেশভাগের পর পাকিস্তান সরকার আমলেও ভূমির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে কোনো টেকসই ও সমতাভিত্তিক সংস্কারের উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। বরং, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পত্তিকে কালো তালিকাভুক্ত করে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টির মাধ্যমে এক লক্ষেরও অধিক পাহাড়ি আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজ ভিটে-মাটি হারিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু তাই-ই নয় নারীদের ওপর ক্রমাগত নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছে। তা সে পারিবারিক নির্যাতন বা সামাজিকভাবে নির্যাতন যেখানেই বলা হোক।

প্রচলিত বৈষম্যমূলক রীতি-নীতি সংস্কারের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী

নারীর অধিকার মানবাধিকার। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেকক্ষেত্রে নারীকে অবমূল্যায়ন, অধঃস্তন হিসেবে বিবেচনা করার প্রবনতা এত বেশী যে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন যা একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ ও লৈঙ্গিক সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে, জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদ, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) সহ বিভিন্ন সনদের পক্ষভুক্ত হওয়া ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময় আইন প্রণয়ন করেছেন। এছাড়া, সুপ্রীম কোর্টের হাইকার্ট বিভাগ সময়ে সময়ে বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছেন।

আরো যা আছে

আদিবাসী শব্দ ও মানবাধিকারের বিহুর লগন ০৩

সাউথ এশিয়া মাইনরিটি রিপোর্ট: ২০২১
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য এবং সহিংসতার প্রতিরূপ ০৮

নগরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি : উত্তরণের উপায় ২৮

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

'পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে যখন দূরত্ব সবচে' কমে আসছে, সমাজে যখন বহুমাত্রিক সংস্কৃতির উত্থান ঘটছে ঠিক সেই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু ঘটনাও ঘটছে যা আমাদের নতুন করে ভাবাচ্ছে-আর তার মধ্যে অন্যতম হলো ঘৃনার চর্চা। উল্লেখ্য যে, গত কয়েক দশকে পৃথিবীব্যাপি সংঘটিত ছোট-বড় অনেক সংঘাতের পেছনে জাতীয়তা, জাতিগত কিংবা ধর্মকে কেন্দ্র করে ঘৃণার উপাদান যুক্ত ছিল।' জাতিসংঘের রাবাত প্ল্যান অব একশনে গৃহীত এই বিবৃতিটি বাংলাদেশের পরিস্থিতির সাথেও বেশি মিলে যায়। এখানে ধর্মীয় ও জাতিগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য খুবই সাধারণ। সাম্প্রতিক সময়ে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক কার্যক্রম এবং অসহিষ্ণুতা ছড়ানো ঘৃণার চর্চাকে আরো বৃদ্ধি করেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখন মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে যে কেউ খুব সহজেই অন্যদের দ্বারা ঘৃনামূলক আচরণ; যেমন, যৌন হয়রানি, বর্ণবাদ, রাজনৈতিক পরিহাস এবং অন্যান্য অনেকভাবে হয়রানির শিকার হতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যায় বাংলাদেশ ক্রমশ শীর্ষস্থানে জায়গা করে নিচ্ছে এবং গত কয়েক বছরে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা অবিশ্বাস্য হারে বাড়ছে। জানুয়ারি ২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১১২.৭১৩ মিলিয়ন। ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯ মিলিয়ন বেড়েছে। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪৩ মিলিয়ন। ফেসবুকে বিভিন্ন ইস্যুতে যুক্তি-তর্ক প্রায়ই ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যে অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি করছে এবং এই অসহিষ্ণুতা থেকে প্রায়ই কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্কৃতি বা ধর্মের প্রতি খারাপ আচরণ বা ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, ফেসবুক পেজ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘৃণা ছড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে যেন সহিংসতা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা না যায়, ঘৃণা-বিদ্বেষমূলক বা মিথ্যা-হয়রানীমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে দেয়া না যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আদিবাসী শব্দ ও মানবাধিকারের বিহুর লগন

অধ্যাপক ড. এস. এম. মাসুম বিল্লাহ

শব্দার্থের রূপান্তর হয়। ইন্ডিজেনাস (indigenous) শব্দেরও হয়েছে। আমরা বাংলাতে এর অর্থ করেছি আদিবাসী। এককালে আদিবাসী বলতে বাইরের লোক আসার আগে থেকেই যাঁরা একটা ভূখন্ডে বসবাস করছিলেন তাঁদেরকে (native) এবং তাঁদের ধারাবাহিক প্রজন্মকে (historical legacy) বোঝাতো। বর্তমানকালে আদিবাসী শব্দের অর্থে অনেক ভিন্নমাত্রা যুক্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের হাত দিয়েই সেটা হয়েছে। এর প্রতিফলন নানান দেশের সংবিধানে ও আইন ব্যবস্থায়ও পড়েছে। নৃ-বিজ্ঞানী ও আইনজ্ঞরা বর্তমানকালে পৃথিবীব্যাপী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিম্নোক্ত চরিত্রগুলো সাব্যস্ত করেছেন:

(১) তাঁরা স্মরণাতীতকাল থেকে একটা ভূখন্ডে বসবাস করছেন; এবং তাঁদের ইতিহাস কথনে শ্রুতির (myth) প্রাধান্য রয়েছে;

(২) তাঁরা ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চনার, বিশেষ করে ভূমি বঞ্চনার শিকার হয়ে বর্তমানে প্রান্তিক পর্যায়ে চলে গেছেন (historical deprivation and marginalization);

(৩) শারীরিক, ভাষিক, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতিগতভাবে এঁরা মূলধারার মানুষ থেকে স্বতন্ত্র (distinctive values and culture);

(৪) প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক নিবিড় (connectedness to environment);

(৫) এঁরা নিজেদেরকে আদিবাসী পরিচয়ে পরিচিত করাতে এবং নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে চান (self identification and maintenance of heritage)।

এর বাইরেও আরো অনেক চেহারা আদিবাসী সমাজের রয়েছে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে সেটা হেরফের হয়। জাতিসংঘে আদিবাসীদের নানান নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে আশির দশক থেকে। এ বিষয়ে ইন্ডিজেনাস পিপলস, এবোরিজিনাল, এথ্নিক মাইনোরিটি, ট্রাইব্স ইত্যাদি শব্দের চল লক্ষণীয়।

এর মধ্যে আইনে ইন্ডিজেনাস শব্দটি সার্বজনীনতা পেয়েছে। শব্দটির উন্মেষের মাত্রিকতা ও সমাজ-বৈচিত্র্য বিবেচনায় জাতিসংঘ ইন্ডিজেনাস শব্দটির কোনো সংজ্ঞাদান থেকে সচেতনভাবে বিরত থেকেছে। জাতিসংঘের দূত হোসে মার্টিনেজ কোবো ইন্ডিজেনাস জনগোষ্ঠীর মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য কিছু মানদন্ড উল্লেখ করেছেন তাঁর ১৯৮৭ সালের সমীক্ষায়। উপরে উল্লিখিত পাঁচটি মানদন্ড আমি মার্টিনেজের কথা থেকেই একটু পরিমার্জিত করে উল্লেখ করলাম।

তাহলে আমি বোধ হয় বোঝাতে পারলাম যে, আদিবাসী মানে শুধু আদিকাল থেকে যাঁরা কোথাও বাস করেন তাঁরা নন। আদি থেকে বাস করা একটা অনুষঙ্গ বটে, তবে শর্ত নয়। বাংলাদেশে সমতল এলাকা ও পাহাড়ী জনপদ মিলে প্রায় ৫০ রকমের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন। অধ্যাপক মেসবাহ কামাল দেখিয়েছেন যে, এই সংখ্যা ৭২ কি ৭৫। কিবরিয়া খালেকের হিসেবে ২৭ রকমের। সরকার স্বীকার করে ২৯ রকমের আদিবাসীদেরকে। ২০২২ সালের জনশুমারিতে আদিবাসীর সংখ্যা দেখানো হয়েছে সাড়ে ষোলো লাখ। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের হিসেবে এদেশে আদিবাসীর সংখ্যা ৩০ লাখের বেশি। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রায় ৩০-৪০ টি আদিবাসী ভাষার প্রচলন রয়েছে। এই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী উপরে উল্লিখিত পাঁচটি মানদন্ডের প্রায় সবকটিই পূর্ণ করে।

সাংবিধানিক আইনজীবী কাওসার আহমেদ (ব্রিল, ২০১০) তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে যুক্তি দিয়েছেন যে, এমনকি বাংলাদশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী কেবল প্রান্তিকতা মানদন্ডে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ বিবেচনায় আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি রাখেন। কাওসার আহমেদ-এর লেখা থেকে এও দেখানো যায় যে, আদিবাসী সংক্রান্ত ২০০৭ সালের জাতিসংঘ ঘোষণায় (UNDRIP) আদিবাসী সংজ্ঞার অস্পষ্টতার অজুহাতে বাংলাদেশের ভোটদান থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত ছিল ঠুনকো ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কেননা, জাতিসংঘ আদিবাসী শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করবে না মর্মে সেই ১৯৮২ সালেই নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলো।

কাওসার আহমেদ-এর যুক্তির সঙ্গে আমি দুটি বিষয় যুক্ত করতে চাই:

এক. মূল্যবোধের পার্থক্য প্রশ্নে:
প্রাধান্য বিস্তারকারী ধারায় (discourse, এখানে, বাঙালি) মনে করা হয়, ভূমি আমার। কিন্তু অবদমিত ধারায় (এখানে, আদিবাসী) মনে করা হয়, আমিই ভূমির বা সঞ্জীব দ্রং যেমনটি লিখেছেন, ধরিত্রী আমার নয়, আমিই ধরিত্রীর। আদিবাসী ধারায় মানুষ সামগ্রিকভাবে ভূমির পাহারাদার (collective stewardship)। ব্যক্তিমালিকানার জয়জয়কারের যুগে, নব্য-উন্নয়নবাদ ধারণার অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রবেশের সময়কালে, ভূমি মালিকানার এই মূল্যবোধ আদিবাসী সমাজকে জিঁইয়ে রেখেছে ও এর বৈভব তুলে ধরেছে। এদিক দিয়ে তাঁদের আদিবাসী পরিচয় খর্ব হবার নয়। আদিবাসী দর্শনে ভূমিই জীবন, ভূমিই জীবনের পথ, ভূমিই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

এবং দুই. নিজেদের আদিবাসী হিসেবে তুলে ধরার অধিকার। আন্তর্জাতিক আইনের বিদগ্ধজনেরা এই আত্ম-উপস্থাপনকে 'ইন্ডিজেনাসনেস' এর অন্যতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এটা ছাড়া আদিবাসীত্ব কল্পনা করা কঠিন। অনেকে

বলে থাকেন যে, পাহাড়ি উপজাতিরা যদি আদিবাসী হয়, তাহলে বাঙালিরা কি উড়ে আসলো? তাঁরাও কি আদিবাসী নন? এর উত্তর হলো না তাঁরা আদিবাসী নন, বরং বাঙালিই। সেটাই তাঁদের জন্য বেশি মর্যাদার, আবেগের এবং পূর্ণতার। তাছাড়া, একজন বাঙালি নিজেকে কখনোই আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দেন না। সুতরাং, আদিবাসী হবার জন্যে যে এই নাম আনন্দচিত্তে উপস্থাপন ও তা ধারণ করবার মানদন্ড রয়েছে, বাঙালি শব্দটি সেটি প্রকাশ করে না। তাছাড়া, এরকম যুক্তি জাত্যাভিমানমূলক। এটি শুনতে একটু প্রবঞ্চনামূলক শোনায় এ কারণে যে, আমি দেখেছি, বেশিরভাগ বাংলাদেশের মানুষ সগৌরবে নিজেকে বাঙালি বলতে চান না। সেখানে তারা ধর্ম, ভূগোল ও ভারত এনে হাজির করেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইন্ডিজেনাস-এর বাংলা হিসেবে কি আদিবাসী অভিধাটি মানানসই হয়েছে? এর উত্তর হচ্ছে, হয়তো হয়েছে, হয়তো হয়নি। কিন্তু এতে কিছু যায় আসেনা। আদিবাসী ধারণা একটা শ্রুতিসখ্য বাগড়া (soothing discourse)। এর মধ্যে নৃ-তাত্ত্বিক, সামাজিক, ঐতিহ্যগত, ইতিহাস-বন্ধন এবং সর্বোপরি আইনি ব্যাপার লুকিয়ে আছে। আমরা এক্ষেত্রে আর যেসব বিকল্প শব্দ ব্যবহার করি, এই যেমন, উপজাতি, ট্রাইব, পাহাড়ি, ভূমিজ, ভূমিপুত্র, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ইত্যাদি এক একটা দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। এর কোনো কোনোটা অনেক সময় অবনমনের এবং আত্ম-অবমানের। আবার কোনো কোনো সময় এসব শব্দ ব্যবহারের মেজাজ, পরিসর ও ধরনভেদে সমার্থক বা কাছাকছি অর্থ পরিগ্রহ করে। উপস্থাপন শৈলী ও সুর অনেক সময় নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়।

এবারে সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতির স্বরূপ নিয়ে দু একটি কথা বলি। স্বীকৃতির মূল কাজ হলো গোনায় ধরা। আপনি আছেন এটা হিসাবের মধ্যে রাখা। এতে দেশের বহুত্ববাদী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মন ও মান প্রকাশ পায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, নেশনের (nation) মধ্যে এলিয়েনেশন (alie-nation) লুকিয়ে থাকে। 'আমি দেখি না, আমি গুনিনা' - দৃষ্টিভঙ্গি অশান্তির জন্ম দেয়। ফলে 'শান্তি বাহিনীর' জন্মের প্রয়োজন পড়ে। অনেকে মনে করেন, আদিবাসী স্বীকৃতি দিলে, পাহাড়িরা বিদ্রোহ করে বসবে। তো স্বীকৃতি না দিয়েও তো পাহাড়ে সত্তর দশক থেকে ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তি অবধি ত্রিশ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে! শান্তি চুক্তি-উত্তর পাহাড়েও তো পূর্ণ শান্তি আসে নাই। এই জন্যে দেশে থাকা বিভিন্ন জাতিগত বৈচিত্র্যকে আমলে নেয়া লাগে। ১৯৭২ সালের সংবিধান ভাষাগতভাবে আদিবাসীদের উপেক্ষা করেছে, আর সংবিধানে সামরিক কাঁচির খোঁচা তাঁদেরকে ধর্মগতভাবে প্রান্তিকীকরণ করেছে।

অবশেষে, পনেরোতম সংশোধনীর হাত দিয়ে বেশ কিছু ব্যাপারের সঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ কম প্রশংসিত বিষয় সংবিধানে ঠাঁই পেয়েছে। এর একটি হলো ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিকচ জনগোষ্ঠীর অধিকারের সন্নিবেশের মাধ্যমে আঞ্চলিক সংস্কৃতির লালন (অনুচ্ছেদ ২৩ক) এবং প্রজন্মান্তরের অধিকার (present and future citizens that includes the indigenous community) সন্নিবেশের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণের বিধান (অনুচ্ছেদ ১৮ক)। ভালোভাবে, হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে ২৩ক অনুচ্ছেদটির সম্পূর্ণ উল্লেখ জরুরি: রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

শব্দের মিছিলে আদিবাসী শব্দটা এখানে বাদ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় রাজনীতি যেমন ছিলো, তেমনি আদিবাসী নেতাদের দরকষাকষির লাজুকতাও ছিলো। কিন্তু তবুও কি অলিখিতভাবে আদিবাসীত্বের 'সেন্স এন্ড সেন্সিবিলিটি' এখানে প্রতিফলিত হয়নি? আমার মনে হয় হয়েছে। সংবিধান প্রণেতাগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধা পড়ে গেছেন। অন্তত ২০১১ পূর্ববর্তী সময়ে যেখানে স্বীকৃতি একেবারেই ছিলোনা, সেখানে উপজাতি শব্দকে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'নৃ-তাত্ত্বিকতা', 'সম্প্রদায়', 'আঞ্চলিক সংস্কৃতি' , 'ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশ', 'প্রজন্মান্তরের অধিকার' ইত্যাদি কথামালা দ্বারা সমর্থন এক অপূর্ব সাংবিধানিক আবেশ ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে। একজন মানবদরদী-মানবাধিকার-প্রজ্ঞাবান বিচারপতির হাতে পড়লে এখান থেকে আদিবাসী-উন্মুখ মানবাধিকার আইনবিজ্ঞান বের করা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়। নমস্য বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (রহমান, ১৯৮৯) লিখেছেন:

"শব্দ দুর্দিনের বড় আশ্রয়। নিঃসঙ্গ অবসরে শব্দ হতে পারে এক দারুন আমুদে সহপাঠী। স্বর্ণ শব্দের অনুসন্ধানে একটা মৃগয়ার আমেজ রয়েছে। শব্দের অর্থ, গূঢ়ার্থ বা নির্গলিতার্থ নির্ধারণ এবং কূটার্থ প্রয়োগকে বাধাদান আদালতের একটা কর্তব্যকর্ম। আবার শব্দের সীমানা পেরিয়ে সৃষ্টিধর্মী রচনা যেমন নতুন ব্যঞ্জনার দিগন্ত উন্মোচন করে, তেমনি আইনের ক্ষেত্রে দৃশ্যত অবিচারের প্রতিকারের জন্যে শব্দের সীমানা অতিক্রম করে আদালত ইনসাফ বা ইকুইটির জন্ম দেয়।"

"আঞ্চলিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ"-- বিকাশ বড় দারুন শব্দ। ইংরেজির ডেভেলপমেন্ট, আর বাংলার বিকাশ এক কথা নয়। বিকাশ মানে 'বিশেষভাবে কাশ' দেয়া, জানান দেয়া। বিকাশ মানে ফুটতে দেওয়া।

নজরুল বলেন:

মোর বিকশিল আবেশে তনু,
নিরুপম, মনোরম।

আর রবীন্দ্রনাথ কহেন:

অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে।

সুতরাং কোনো মহামহিম আমলা যদি মনে করেন, তাঁরা আদিবাসী শব্দ ব্যবহার না করে জিতেছেন, তবে আসলে তাঁরা হেরেছেন। মহাত্মা মান্না দে'র একটা গান আছে এরকম:

তুমি অনেক যত্ন করে, আমায় দুঃখ দিতে
চেয়েছো, দিতে পারোনি
কি তার জবাব দেবে
যদি বলি তুমিও কি একটুও হারোনি?
একটুও হারোনি?

রাষ্ট্র কি আদিবাসীদের দুঃখ দিয়ে একটুও হারেনি? আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন সরকার সেঁধে ঝামেলা পাকায় কেনো বুঝিনা। পরিপত্র দিয়ে বলে 'আদিবাসী' শব্দ নাকি ব্যবহার করা যাবেনা। এই প্রকারের ভাবনা বলাই বাহুল্য উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। আদিবাসী শব্দটি সংবিধানে লেখার উদারতা দেখাতে পারিনি আমরা, আবার এখন মুখেও বলতে পারবোনা? সে কি কথা? যে রাষ্ট্রের জন্ম আন্তর্জাতিক আইনের পথ মাড়িয়ে, সে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনকে উপেক্ষা করে কোন সে যুক্তিতে? ভাবতে কষ্ট হয়।

যারা থেকে থেকে প্রজ্ঞাপন/আদেশ/ পরিপত্র জারি করেন তাদের মুখশ্রী দেখতে ইচ্ছে করে। নাগরিকরা আমাকে কি নামে ডাকবেন সেটাতো আমার এবং নাগরিকদের রসায়নের ব্যাপার! রাষ্ট্র আমাকে ঠিক করে দেবে আমার নাম কি হবে?

আদিবাসী শব্দটার একটা সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য দেখার চোখ থাকতে হয়। আমরা সংবিধানটা সোনার ধান দিয়ে ভরে ফেলেছি কিনা, তাই আদিবাসী নামক কোনো শব্দের সেখানে ঠাঁই নেই। আচ্ছা সে না হয় বুঝলাম।

কিন্তু সেই হৃদয়টা গেল কোথায় আমাদের, হৃদয়টা? সংবিধান বাস করে কোথায় জানেন? কোনো শব্দে নয় -- বোধে, মনে ও মননে। মার্কিন মুলুকের অন্যতম সেরা বিচারপতি লার্নেড হ্যান্ড বলেন:

"সংবিধান যদি হৃদয় থেকে মরে যায়, ওই দেশকে কোনো আইন, কোনো সংবিধান রক্ষা করতে পারেনা।"

সংবিধানে উল্লেখ না থাকলেই কোনো ব্যাপার সংবিধান-অসম্মত হয়না। ভাত তো সংবিধানে নেই, কিন্তু 'খাদ্য' শব্দটা আছে। তাই বলে কি ভাত শব্দটা অসাংবিধানিক হয়ে যাবে? সংবিধান সম্মত মানে সংবিধানে আছে এরকম না, এর মানে

হলো সংবিধানিকতার দর্শনে কোনো একটা ব্যাপার উত্তীর্ণ কিনা? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের মূর্খতা মুখরতায় পর্যবসিত হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ বলেন:

"যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ
চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই প্রীতি নেই
করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ
ছাড়া।"

আর সাংবিধানিক প্রজ্ঞা বলেতো একটা কথা আছে। সংবিধান নাকি আদিবাসীদের ধারণ করেনা। বললাম করে তো। হয়তো প্রকাশ্যভাবে করে না। সাংবিধানিকতা দুই রকম হয়, একটা হলো আক্ষরিক সাংবিধানিকতা (textual constitutionalsm), আরেকটা হলো চর্চিত সাংবিধানিকতা (unwritten constitutionalism)। ওই যে, 'নৃ-তত্ত্ব', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশ' এগুলোর মাঝে ও মাঝারে চর্চিত সংবিধানিকতায় আদিবাসী শব্দটা থাকতে হবে-- সেদিন অবধি, যেদিন আমরা সংবিধানে আদিবাসী শব্দটা সরাসরি লিখতে আর হীনমন্যতায় ভুগবোনা। ওয়াল্ট হুইটম্যানকে ধার করি:

"Do I contradict myself?
Very Well then, I contradict myself"
"I am large, I contain multitudes" (replies the constitution).

- [Walt Whitman, "Song of Myself" Leaves of Grass (1891-92)].

শুনেছি আদিবাসীদের বিহুর অনুষ্ঠান সার্বজনীন, সর্বত মঙ্গলের, মানুষের। বৈসাবির আবেদন সার্বজনীন। মানবাধিকারের আবেদনও সার্বজনীন। মানবাধিকারের এই বিহুর লগনে আমি জীবনে জীবন মেলাবার কথা বললাম। মধুর সেই লগন আকাশে বাতাসে সব জায়গায় ছড়িয়ে যাক। আসুন আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস (৯ আগস্ট) জাতীয়ভাবে পালন করে শহীদ মিনারের পাদদেশে সবাই মিলে নৃত্য করি:

চম্পা ফুটিছে, চামেলী ফুটিছে,
তার সুবাসে ময়না আমার ভাসিল রে ...
বিহুর এ লগন, মধুর এ লগন ...

লেখক ডিন, আইন অনুষদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

সাউথ এশিয়া মাইনরিটি রিপোর্ট: ২০২১

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য এবং সহিংসতার প্রতিরূপ

-মঞ্জুরুল ইসলাম ও জাকির হোসেন

ভূমিকা

'পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে যখন দূরত্ব সবচে' কমে আসছে, সমাজে যখন বহুমাত্রিক সংস্কৃতির উত্থান ঘটছে ঠিক সেই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু ঘটনাও ঘটছে যা আমাদের নতুন করে ভাবাচ্ছে- আর তার মধ্যে অন্যতম হলো ঘৃনার চর্চা। উল্লেখ্য যে, গত কয়েক দশকে পৃথিবীব্যাপি সংঘটিত ছোট-বড় অনেক সংঘাতের পেছনে জাতীয়তা, জাতিগত কিংবা ধর্মকে কেন্দ্র করে ঘৃণার উপাদান যুক্ত ছিল।'[১] জাতিসংঘের রাবাত প্ল্যান অব একশনে গৃহীত এই বিবৃতিটি বাংলাদেশের পরিস্থিতির সাথেও বেশি মিলে যায়। এখানে ধর্মীয় ও জাতিগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য খুবই সাধারণ। সাম্প্রতিক সময়ে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক কার্যক্রম এবং অসহিষ্ণুতা ছড়ানো ঘৃণার চর্চাকে আরো বৃদ্ধি করেছে।

ধর্মকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ইতিহাস এই উপমহাদেশে অনেক পুরনো এটি ঔপনিবেশিক যুগের আগেও ছিল। যদিও ব্রিটিশরা তাদের শাসনের প্রয়োজনে 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আরো উস্কে দিয়েছে।[২] অন্যদিকে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।[৩] ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হলেও কয়েক বছরের মধ্যেই সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে তা অদৃশ্য হয়ে যায়, যা সাম্প্রদায়িকতা উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছে। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ঘৃণামূলক বিবৃতি বা বক্তব্য কীভাবে ভূমিকা রাখছে তার একটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে সাধারণভাবে ধর্মীয় ও জাতিগত- এইদুই ভাগে ভাগ করা যায়, যদিও কোন কোন

1. Human Rights Council, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the expert workshops on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred ('Rabat Plan of Action') 11 January 2013, A/HRC/22/17/ Add.4, p-7, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/ Rabat_draft_outcome.pdf.
2. Akhilesh Pillalamarri, 'The Origins of Hindu-Muslim Conflict in South Asia, What are the historical origins of animosities between South Asia's two largest religions?', The Diplomat, March 16, 2019, https://thediplomat.com/2019/03/theorigins-of-hindu-muslim-conflict-in-south-asia.
3. Amena A. Mohsin, 'Religion, Politics and Security: The Case of Bangladesh' in Satu Limaye, Robert Wirsing and Mohan Malik (eds), Religious Radicalism and Security in South Asia (Hawaii: Asia-Pacific Center for Security Studies, 2004).

জাতিগত সংখ্যালঘুরা আবার ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীরও অংশ। এই প্রতিবেদনে সংখ্যালঘু বিভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের দিকটি বেশি আলোচিত হয়েছে কারণ সংখ্যা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে তারাই বেশি ঘৃণামূলক আচরণ ও সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য কিছু সম্প্রদায় যেমন, আহমদীয়া, বিহারী এবং দলিত সম্প্রদায়ের বিষয়টিও এই প্রতিবেদনে আলোচনা করা হয়েছে তাদের প্রতি ঘৃণামূলক বিবৃতি বা বক্তব্যের এর তীব্রতা বিবেচনা করে।

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বিবৃতি বা বক্তব্যের কারণ, প্রক্রিয়া এবং পরিণতি বিশ্লেষণ এবং এ থেকে উত্তরণের সুপারিশ তুলে ধরা। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো-

- বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য/ঘৃণামূলক কার্যকলাপের বর্তমান প্রবণতাসহ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ
- ঘৃণামূলক বক্তব্য কীভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে তা আলোচনা
- সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকারের পরিসর নিশ্চিত করার জন্য আইনী কাঠামো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাগুলো (আন্তর্জাতিক চুক্তি, সনদ ইত্যাদি) পর্যালোচনা
- ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য বা আচরণকে মোকাবেলা এবং এর সম্ভাব্য পরিণতি হ্রাস করার জন্য সুপারিশ উপস্থাপন

এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য, প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, সেমিনার/সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উপস্থাপনা, ডিজিটাল তথ্য/উপাত্ত, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং দৈনিক সংবাদপত্রে উপস্থাপিত তথ্য ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এর কারণে অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি আলোচনা বা সাক্ষাৎকারের পরিবর্তে অনলাইন বা অনলাইনভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য যেভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সৃষ্টি করে

হেট স্পিচ বা ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তৃতার সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা নেই। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী হেট স্পিচ হচ্ছে, " বিবৃতি, লেখা বা আচরণের মাধ্যমে যে কোন ধরণের যোগাযোগ যা কোন ব্যক্তি বা দল বা কারো ধর্ম, নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয়তা, জাত, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গীয় পরিচয় বা অন্য কোন পরিচয়ের কারণে তাদের ওপর আক্রমন বা নিন্দনীয় বা বৈষম্যমূলক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়"। এই ধরনের আচরণ প্রতিরোধ করা না হলে তা প্রান্তিক/সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতার রূপ নিতে পারে। কিছু বিবৃতি তাৎক্ষনিক সহিংসতা সৃষ্টি না করলেও অসহিষ্ণুতা এবং ক্ষোভের বীজ বপন করে যা পরবর্তীতে ঘৃনামূলক কার্যক্রমের বৈধতা প্রদান করে।[৪]

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী কারা?

যদিও 'সংখ্যালঘু' শব্দটি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, তথাপিও ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, জাতিগতভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে জনসংখ্যার সংখ্যালঘু অংশ বলা হয়ে থাকে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশের ১৪৪ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা হলো প্রায় ১৩০ মিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার ৯০.৪ শতাংশ।[৫] অন্যান্য ধর্মীয়, জাতিগত, এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ। এছাড়াও আহমদীয়া এবং বিহারীদের ছোট ছোট মুসলিম উপদল রয়েছে বাংলাদেশে।[৬]

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ১২.৭৩ মিলিয়ন হিন্দু জনসংখ্যা রয়েছে যা মোট জনসংখ্যার ৮.৫ শতাংশ। জনসংখ্যার প্রায় ০.৯ শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশেরও বেশি পার্বত্য চট্টগ্রাম কেন্দ্রীক বসবাসরত । মূলত রাখাইন, চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা এবং অন্যান্য জুম্ম জনগোষ্ঠীরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, বাকি .৩৫ শতাংশ বাঙালী।[৭] বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা মোট জনসংখ্যার ০.৪ শতাংশ (প্রায় ৬০০,০০০) ।

বাংলাদেশ ৫০টিরও বেশি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর আবাসস্থল।[৮] ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুয়ায়ী, দেশে মোট আদিবাসী জনসংখ্যা ১.৬ মিলিয়ন অর্থাৎ তারা মোট জনসংখ্যার ১.৮ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও আদিবাসীরা দাবি করে যে তাদের জনসংখ্যা উল্লেখিত সংখ্যার অন্তত দ্বিগুণ।[৯] বাংলাদেশের আদিবাসীদের প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায়- পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী (পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চল) এবং সমতলে

4.'What is Hate Speech?', KAICIID Dialogue Centre, October 21, 2019, https:// www.kaiciid.org/news-events/news/what-hate-speech.
5. Population and Housing Census 2011, National Report, Volume -1, Analytical Report, Bangladesh Bureau of Statistics, http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/PopCenZilz2011/NRV-61Report2011.pdf
6. A pejorative term for Urdu-speakers who mostly migrated from Bihar in India during and after Partition in 1947
7. Buddhism in Bangladesh, see: https://artsandculture.google.com/entity/ buddhism-in-bangladesh/m011b7yzf?hl=en.
8. Gazette Ministry of Cultural Affairs, Government of the Republic of Bangladesh, S.R.O. No- 78/Act/2019 (Dhaka: Gazette Ministry of Cultural Affairs, March 19, 2019).
9. Kamal M (ed.), Parliamentary Caucus on Indigenous Peoples (Bangladesh): A Genesis of Parliamentary Advocacy in Bangladesh', February 2010- January 2014, (Dhaka: Research and Development Collective, 2014).

বসবাসকারী আদিবাসী। এই আদিবাসীরা আবার ধর্মের দিকে দিয়ে বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্টধর্ম, অ্যানিমিজম এবং অন্যান্য বিশ্বাসে বিভক্ত।

আহমদীয়ারা মুসলিম বিশ্বাসের একটি ভিন্ন ধারার অনুসারী। তারা বিশ্বাস করে যে প্রতিশ্রুত ভবিষ্যত মুক্তিদাতা (যাকে ইমাম মাহদীও বলা হয়ে থাকে) তিনি ইতিমধ্যে এসেছেন এবং ১৮৮৯ সালে আহমদীয় মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১০] বাংলায় ১৯১৩ সালে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ১২০টি স্থানীয় ইউনিট রয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলায় এই সম্প্রদায়ের অনুসারীদের সংখ্যা বেশি।[১১]

বাংলাদেশে 'বিহারী' শব্দটি নেতিবাচক হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিহারীরা মুসলিম ধর্মভুক্ত জনগোষ্ঠী হলেও ভাষা ও সাংস্কৃতির কারণে সমাজে তারা আলাদা হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশের উর্দুভাষীদের বেশিরভাগ ভারতের বর্তমান বিহার রাজ্য থেকে এসেছে। কিন্তু, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকার জন্য তাদের দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এবং তখন থেকেই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে 'বিহারী' শব্দটি ঘৃণাবাচক শব্দে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহরের ১৩ টি এলাকায় ১১৬ টি ক্যাম্পে (জেনেভা ক্যাম্প হিসেবেই বেশি পরিচিত) প্রায় ৩০০,০০০ অবাঙালি উর্দুভাষী বসবাস করছে।[১২]

সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হেট স্পিচ বা ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্যের বিস্তার

ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সহিংসতা ধর্মীয়, সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং আধিপত্য বিস্তারের সাথে গভীরভাবে যুক্ত।[১৩] ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের সাথে সাথে দুটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের (ভারত, পাকিস্তান) মধ্যে শত্রুতা বেড়ে যায়, যা দেশ দু'টির আন্ত:রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ওপরও প্রভাব ফেলে। এর প্রভাব রাষ্ট্র দুটির সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপরও পরিলক্ষিত হয়।[১৪] ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ ছিল অমুসলিম জনসংখ্যা। সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সেই আধিপত্যকে উল্টে দেয় এবং হিন্দু জনগোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে বাস করতে শুরু করে যার সাথে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের অনুভূতির সম্পৃক্ততা ছিল প্রবল।[১৫]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় অসম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করে শুরু হলেও ধর্ম শীঘ্রই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'জাতীয়তাবাদ', 'সমাজতন্ত্র', 'গণতন্ত্র' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[১৬] এক দশকের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা ও মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে সংবিধান থেকে অপসারিত হয় আর এ কাজটি করা হয় ১৯৭৯ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে। ১৯৮৮ সালে সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[১৭] বাংলাদেশে বর্তমান ইসলামী দলগুলোর কার্যক্রম সরাসরি অসাম্প্রদায়িকতার মূলনীতির বিরোধী এবং মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সাথে শান্তিপূর্ণ বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক সহ-অবস্থানকে অসম্ভব করে তুলেছে।[১৮]

বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী মানবাধিকার, ধর্মীয় অধিকারের লঙ্ঘনসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে, যার পেছনে সংখ্যগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অসহিষ্ণুতার চর্চা অন্যতম দায়ী। ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টির একটি জনপ্রিয় হাতিয়ার এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা তৈরিতে প্রায়ই এর ব্যবহার হচ্ছে। সাম্প্রতিক ইন্টারনেট এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হেট স্পিচ বা ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে গুজব ছড়ানো, হয়রানি এবং এমনকি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহিংসতার উসকানি সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশে ফেসবুককে ব্যবহার করে ঘৃণামূলক বিবৃতি ছড়িয়ে অনেকগুলো সহিংসতা ঘটানো হয়েছে। গত একদশকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যত সহিংস ঘটনা ঘটেছে তার শুরুটা হয়েছে ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে এমন ফেসবুক পোস্টের প্রতিক্রিয়া থেকে।

প্রায় সবকটি সহিংসতার ঘটনার ধরণ একই রকম। দেখা গেছে ধারাবাহিকভাবে- ফেসবুকে

10. Al Islam, 'What is the Difference between Ahmadi Muslims and other Muslims?', Al Islam, n.d., https://www.alislam.org/question/difference-betweenahmadi-muslims-others
11. Mahmud Tarek, 'How Ahmadiyya Faith Found Space in Bangladesh', Dhaka Tribune, June 16, 2017, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/06/12/ ahmadiyya-faith-found-space-bangladesh.
12. Human Rights Situation of Urdu-speaking Community in Dhaka City 2016 (Dhaka: Islamic Relief Bangladesh, 2016).
13. Tapos Kumar Das, 'Minority Exodus in Bangladesh Trends and Causes', ResearchGate, November 2016, https://www.researchgate.net/ publication/331771677_Minority_Exodus_in_Bangladesh_Trends_and_Causes
14. Amena A. Mohsin, Religion, Politics and Security: The Case of Bangladesh, Religious Radicalism and Security in South Asia (Hawaii: Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, 2004), p. 467.
15. Muhammad Ghulam Kabir, 'Minority Politics in Bangladesh', (New Delhi: Vikash Publishing House, 1980), p. 1-7.
16. The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Preamble, http:// bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367.html.
17. 'Evolution of Fundamental Principles of 1972', Liberation War Museum, accessed August 4, 2021, https://www.liberationwarmuseumbd.org/evolutionof-fundamental-principles-of-1972; Bhuiyan, Jahid Hossain, 'Secularism in the Constitution of Bangladesh ', The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, June 2017, 49(33):1-24.
18. Md. Sayeed Al-Zaman, 'Digital Disinformation and Communalism in Bangladesh', ResearchGate, 15(2), 2019', P-72, https://www.researchgate.net/ publication/333310094_Digital_Disinformation_and_Communalism_in_ Bangladesh.

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে পোস্ট প্রকাশ; অতঃপর, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানো এবং মন্দির ও বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট ইত্যাদির ঘটনা ঘটেছে। কিছু কিছু ওয়াজ-মাহফিলেও ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। আহমদীয়া সম্প্রদায় মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী হলেও ভিন্ন মত পার্থক্যের জন্য তাদের কে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। কিছু ইসলামী সংগঠন বা জোট তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে আসছে।[১৯] 'বিহারী শব্দটির দ্বারাও একটি বিশেষ উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে তাদের ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে।

বাংলাদেশের একটি প্রগতিশীল সংবিধান আছে যা লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম বা জাতি নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা ঘোষণা করে। অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, এবং ৩১ ধর্ম ও জাতিগত ভিত্তিতে সমতা এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছে এবং অনুচ্ছেদ ৪১ সবার জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলেছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায়ও বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি ও সনদে অনুস্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে। সম্প্রতি গৃহীত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (DSA) ২০১৮-এ ঘৃণামূলক বক্তব্যকে মোকাবেলা করার জন্য কিছু বিধান যুক্ত করেছে। তবে এই আইনের বিভিন্ন ধারায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে চরমভাবে খর্ব করা হয়েছে বলে এটি বিতর্কিত ও সমালোচিত।

হেটস্পিচ বা ঘৃণামূলক বিবৃতি/ বক্তব্যের প্রকারভেদ

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি নানা ধরণের ঘৃণামূলক বা অপমানসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায় তাদের ধর্ম, পেশা ও সংস্কৃতির কারণে সবচেয়ে বেশি ঘৃণাবাচক আচরণের শিকার হয়ে থাকে। এর মধ্যে 'মালাউন' বা 'মালু' শব্দটি হিন্দুদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ব্যবহৃত শব্দ। মালাউন একটি আরবী শব্দ যার অর্থ অভিশপ্ত অথবা ইশ্বরের করুণা বঞ্চিত।[২০] হিন্দুদের প্রতি ব্যবহৃত অন্যান্য ঘৃণাবাচক শব্দগুলো হলে কাফের, নমো, বিধর্মী, হিন্দুর জাত, ভারতের দালাল, বেঈমান, নাস্তিক, গো-মাতার সন্তান, গো-মুত্রখোর ইত্যাদি। বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠী একদিকে হিন্দু হিসেবে মুসলিমদের কাছে এবং অস্পৃর্শ্য হিসেবে বা নিচু জাত হিসেবে হিন্দুদের কাছ থেকে ঘৃণ্য আচরণের শিকার হয়ে থাকেন। দলিতরা মেথর, চামার, মুচি, নমো, চণ্ডাল ইত্যাদি ঘৃণাবাচক শব্দের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। উর্দুভাষীরা 'বিহারী', 'পাকিস্তানী' ইত্যাদি শব্দের সাথেই বসবাস করে। পাহাড় অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসীরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হলেও সকলকেই চাকমা হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রবণতা দেখ যায় এবং এক্ষেত্রে চাকমা শব্দটি পরিহাস হিসেবেই ব্যবহার করে থাকে মূলধারার জনগোষ্ঠী। এছাড়া চায়না, রোহিঙ্গা ইত্যাদি শব্দগুলোকে শুনতে হয় পাবর্ত্য বা গারো পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসীদের।

হিন্দু সম্প্রদায়কে ব্যাপকভাবে ভারতপন্থী এবং বাংলাদেশের অস্থায়ী নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, আজ অথবা কাল তারা ভারতে চলে যাবে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটি প্রচলিত কথা হল 'বাংলাদেশী হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতক, তারা এখানে খায়, এখানে অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু তারা সবই চিন্তা করে ভারত নিয়ে'। হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার নিয়ে অনেক অশ্লীল মন্তব্য করা হয়। যেমন, উলুধ্বনি[২১] বা সিঁদুর পরা নিয়ে বাজে মন্তব্য করা, ৩৩ কোটি দেবতার সংখ্যা নিয়ে পরিহাস, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনলাইন জরিপে উত্তরদাতাদের মধ্যে, ৮৭.৮ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে তারা বা তাদের আত্মীয়/বন্ধু/পরিচিতরা ঘৃণামূলক আচরণের বা সহিংসতার শিকার হয়েছেন। কখনো হেট স্পিচ বা সহিংসতার শিকার

19. Stephan Uttom and Rock Ronald Rozario, 'Clic Demands Bangladesh Ahmadis Be Declared 'Non-Muslim', Union of Catholic Asian New, April 18, 2019, https://www.ucanews.com/news/cleric-demands-bangladesh-ahmadis-bedeclared-non-muslim/85004#.
20. Md. Sayeed Al-Zaman, 'Digital Disinformation and Communalism in Bangladesh', ResearchGate, 15(2), 2019, p. 72, https://www.researchgate.net/publication/333310094_Digital_Disinformation_and_Communalism_in_ Bangladesh.
21. Ululating sounds made during weddings and other auspicious occasions by Hindus, especially Bengalis.

হয়েছেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ৮৩.১ শতাংশ বলেছেন তাদের ধর্ম, পেশা এবং জাত নিয়ে ঘৃণামূলক বিবৃতি/বাক্য শুনেছেন। ২৫.৪ শতাংশ তাদের ধর্ম এবং জাতের কারণে ঘৃণামূলক আচরণের শিকার হয়েছেন, ১১.৩ শতাংশ শারিরীকভাবে হেনস্তার শিকার হয়েছেন, ৩১ শতাংশ ঘৃণামূলক বিবৃতি থেকে সংগঠিত সহিংসতার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন, ৩৫.২ শতাংশ স্কুলে ঘৃণামূলক আচরণের শিকার হয়েছেন, ৪০.৮ শতাংশ তাদের সংস্কৃতি, প্রথা বা রীতি নিয়ে বাজে মন্তব্যের অভিজ্ঞতা রয়েছে, ২৬.৮ শতাংশ বলেছে যে তাদের জাতের কারণে আলাদাভাবে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখন মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে যে কেউ খুব সহজেই অন্যদের দ্বারা ঘৃনামূলক আচরণ; যেমন, যৌন হয়রানি, বর্ণবাদ, রাজনৈতিক পরিহাস এবং অন্যান্য অনেকভাবে হয়রানির শিকার হতে পারে।[২২] সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যায় বাংলাদেশ ক্রমশ শীর্ষস্থানে জায়গা করে নিচ্ছে এবং গত কয়েক বছরে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা অবিশ্বাস্য হারে বেড়েছে। জানুয়ারি ২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার[২৩] মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১১২.৭১৩ মিলিয়ন।[২৪] ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯ মিলিয়ন বেড়েছে।[২৫] এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪৩ মিলিয়ন।[২৬] ফেসবুকে বিভিন্ন ইস্যুতে যুক্তি-তর্ক প্রায়ই ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যে অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি করছে এবং এই অসহিষ্ণুতা থেকে প্রায়ই কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্কৃতি বা ধর্মের প্রতি খারাপ আচরণ বা ঘৃণামূলক বিবৃতি/বক্তব্য তেরি হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে ফেসবুক পেজ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘৃণা ছড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[২৭]

অনলাইন সমীক্ষার উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫০.৬ শতাংশ বলেছেন যে ঘৃণামূলক বক্তব্যের প্রবণতা বাড়ছে, যেখানে ৭.৬ শতাংশ বলেছেন যে এটি কমেছে। বাকি ৪১.৮ শতাংশ বলেছেন যে এটি একই রকম রয়ে গেছে। অধিকন্তু, উত্তরদাতাদের ৭৯ শতাংশ একমত হয়েছেন যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সংখ্যালঘু জনাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। যেকেনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভূয়া তথ্য, বিকৃত ছবি, ভিডিও ইত্যাদিতে সয়লাব হয়ে পড়ে। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের পুলিশ প্রায় ২৫০০ ভুয়া ফেইসবুক পেজ চিহ্নিত করে যেগুলো সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানোর জন্য দায়ী।[২৮]

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বৃবতি/বক্তব্য এবং তা থেকে সহিংসতার বিশ্লেষণ

ফেইসবুক ভুয়া তথ্য এবং টেম্পার করা ছবি দিয়ে সয়লাবের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করা হয় যা প্রায়ই সহিংসতার সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এধরনের ঘটনার কিছু বিশ্লেষন নীচে দেয়া হলো-

কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা

বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছিল ২০১২ সালে কক্সবাজার জেলার রামুতে। উত্তম বড়ুয়া নামের একজন বৌদ্ধ

22. Amit Kumar Das, Abdullah Al Asif, Anik Paul and Md. Nur Hossain, 'Bangla Hate Speech Detection on Social Media Using Attention-Based Recurrent Neural Network', Journal of Intelligent Systems, 2020, https://doi.org/10.1515/ jisys-2020-0060.
23. https://www.worldometers.info/world-population/bangladesh-population
24. Bangladesh Telecommunication Regulatory Board (BTRC) http://www. btrc.gov.bd/content/internet-subscribers-bangladesh-january-2021, * Internet Subscriber means subscribers/subscriptions who have accessed the internet at least once in the preceding 90 days
25. 'Digital 2021: Bangladesh', Data Report, February 11, 2021, https:// datareportal.com/reports/digital-2021-bangladesh.
26. Bangladesh Telecommunication Regulatory Board (BTRC), Number of Facebook users, Statista, https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/ April 2021.
27. Ishman, Alivi and Sadia Sharmin, 'Hateful Speech Detection in Public Facebook Pages for the Bengali Language', ResearchGate, December 2019, https:// www.researchgate.net/publication./ 339328460_Hateful_Speech_Detection_in_ Public_Facebook_Pages_for_the_Bengali_Language.
28. '2,500 Facebook Pages Spread Communal Hatred in Bangladesh', Dhaka Tribune, November 16, 2017, https://www.dhakatribune.com/ bangla-desh/2017/11/16/hundreds-facebook-pages-spreading-communal-hatredbangladesh.

যুবকের ফেসবুক ওয়ালে পবিত্র কোরআনকে নিয়ে একটি অবমাননাকর ছবি ট্যাগ করা হয়। তারপর সেই ছবির স্ক্রিনশট নিয়ে উত্তম বড়ুয়াকে পোস্টদাতা হিসেবে চিহ্নিত করে সেটি ছড়িয়ে দেয়া হয়। মুহূর্তে সেই পোস্ট ভাইরাল হয়ে পড়ে। তারা ছবিটি প্রিন্ট করে বিতরণও করে। এভাবেই একটি স্বার্থান্বেষী মহল স্থানীয় মুসলিম জনতাকে উত্তেজিত করে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় সহিংসতার ঘটনা ঘটায়। রামুর বৌদ্ধ বিহার ও তৎসংলগ্ন বৌদ্ধদের ঘরবাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। কক্সবাজারের অন্য উপজেলা এবং চট্টগ্রামেও বৌদ্ধপাড়ায় হামলা চালানো হয়। এ ঘটনায় ১২টি বৌদ্ধ মন্দির এবং প্রায় ৫০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২৯] যদিও পরে উদঘাটিত হয় যে ঘটনার সাথে অভিযুক্ত উত্তম বড়ুয়া যুক্ত নয়। গণমাধ্যমে আরো উঠে এসেছে যে, এই সহিংসতার পেছনে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরাও যুক্ত ছিল এবং পুলিশ প্রশাসন হামলার ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকার পরও হামলা প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি।

নাসিরনগরে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতা

৩০ অক্টোবর, ২০১৬ ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় ১৭ টি মন্দিরে হামলা এবং ৫৮টি বাড়ি লুটের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নারীসহ ১০০ জন আহত হন।[৩০] রসরাজ নামে এক যুবকের মুসলিম ধর্ম নিয়ে মানহানিকর ফেসবুক পোস্ট নিয়ে এই সহিংসতার ঘটনা ঘটে।[৩১] পরে জানা যায় যে, রসরাজের ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক মানহানিকর পোস্ট দিয়ে এই হামলার ঘটনা ঘটানো হয়। এ ঘটনায় স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের জড়িত ছিলেন বলে ভুক্তভোগীরা দাবী করছেন। শুধু নাসিরনগর নয়, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরো ৭টি জেলায় হিন্দুদের মন্দির ভাঙচুর করা হয়। এঘটনায় পুলিশ আটটি মামলা দায়ের করে। যদিও ২০১৯ সালে এসে সব আসামি জামিনে ছাড়া পায়। পুলিশের একটি তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার নিয়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় ইউনিটগুলো এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটায়।[৩২]

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তদন্তে নাসিরনগরে হামলার উসকানিদাতা হিসেবে বেশ কিছু ওয়েবসাইট ও ফেসবুকের সম্পৃক্ততা, যেগুলোর পরিচালক হিসেবে জামাতে ইসলামের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের জড়িত থাকার সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়।[৩৩] www.banglamail71.com নামের একটি ওয়েবসাইটে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বিষয়ক রসরাজের

29. Star report, 'Extremists linked', The Daily Star, October 1, 2012, http://www. thedailystar.net/news-detail-251955.
30. Kamrul Hasan, 'Nasirnagar Violence Case: No Visible Progress Yet', Dhaka Tribune, November 7, 2017, http://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2016/11/07/nasirnagar-violence-case-no-visible-progress-yet
31. '10 Temples Destroyed in Brahmanbaria, Over 100 Injured', Dhaka Tribune, October 30, 2016, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2016/10/30/ least-10-temples-demolished-brahmanbaria.
32. Ashif Islam Shaon, 'Justice Eludes Victims of Hate Attacks Over Fake Facebook Posts', Dhaka Tribune, November 15, 2017, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/11/15/justice-eludes-victims-hate-attacks-facebook-posts.
33. Probir Kumar Sarker and Manik Miazee, 'Shibir-Run Website Incites Nasirnagar Attacks', Dhaka Tribune, November 5, 2016, https://www. dhakatribune.com/bangladesh/crime/2016/11/05/shibir-website-incitesnasirnagar-attacks

পোস্টটি লিংক শেয়ার করা হয়েছে এবং একই সাথে সহিংসতার ঘটনায় গ্রেফতার ৬ জন মুসলিম ব্যক্তির গ্রেফতারের ঘটনায় নিন্দা জানানো হয়েছে। গণমাধ্যমের তদন্তে বলা হয়েছে, এই ওয়েবসাইটে উক্ত ঘটনা প্রকাশের পর নাসিরনগরে নতুন করে হামলা হয়েছে এই হামলায় কমপক্ষে ৬টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এছাড়াও, অক্টোবর ৩০ এর পর কমপক্ষে ৭টি জেলায় মন্দির ভাঙচুর এবং হিন্দুদের বাড়ি-ঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে।

রংপুর জেলায় হিন্দু গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা[৩৪]

একইভাবে ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে রংপুর সদর উপজেলার ঠাকুরপাড়া গ্রামের হিন্দুদের ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ টিটু রায় নামে একজন হিন্দু যুবক নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে অবমাননাকর একটি পোস্ট করেছেন তার ফেসবুকে। এই পোস্টটি শেয়ার হওয়ার পর একটি দল আশেপাশের এলাকার গ্রামবাসীকে উত্তেজিত করে এবং ১০ নভেম্বর ২০১৭ ঠাকুরপাড়া গ্রামে আক্রমন করে অন্তত ৩০টি বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনায় পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে হামলাকারীদের সাথে সংঘর্ষ হয় এতে একজন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়। টিটু রায়ের পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন যে সে নিরক্ষর এবং ফেসবুক চালাতে পারে না। পরবর্তীতে তদন্তে পাওয়া যায় যে টিটু রায়ের নামে কোন ফেসবুক একাউন্ট নেই।

ফেসবুকের মাধ্যমে ভুয়া খবরকে কেন্দ্র করে চারজনের প্রাণহানি[৩৫]

২০ অক্টোবর ২০১৯, একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনাটি ঘটেছে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায়। বিপ্লব চন্দ্র নামে এক হিন্দু যুবকের মহানবী (সাঃ) কে অবমাননা করে দেয়া একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে তৌহিদী জনতার ব্যানারে স্থানীয় জনগণ রাস্তায় নেমে আসে। বিপ্লব চন্দ্র স্থানীয় থানায় গিয়ে তার ফেসবুক আইডি হ্যাক করে অবমাননাকর পোস্ট ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি অবহিত করে। পুলিশ বিক্ষুদ্ধ জনতার সাথে কথা বলে তাদেরকে বুঝিয়ে ফিরে যেতে সম্মত করতে সমর্থ হলেও একটি স্বার্থান্বেষী দল পুলিশের ওপর হামলা করে তাদের অবরুদ্ধ করে ফেলে। তারা বিপ্লব চন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার দাবী জানায়। পুলিশ আক্রান্ত হলে এক পর্যায়ে গুলি চালায়, এতে ৪ জন নিহত এবং অনেকে আহত হন। পুলিশ ইতোমধ্যে বিপ্লব চন্দ্রের ফেসবুক আইডি হ্যাক এর সাথে জড়িত দুই যুবককে চিহ্নিত ও গ্রেফতার করেছে।

কুমিল্লায় হিন্দু গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা[৩৬]

গত নভেম্বর ২০২০, একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে কুমিল্লায় একটি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটে। এই হামলায় হিন্দুদের পাঁচটি বাড়িসহ এক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের অফিস ভাঙচুর করা হয়। ২০২০ সালের অক্টোবর উগ্রাবাদীদের হাতে ফ্রান্সে একজন শিক্ষককে হত্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। ফ্রান্সে অভিবাসী কুমিল্লার ঐ গ্রামের এক যুবক ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এর গৃহীত ব্যবস্থার সমর্থন করে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেয়। স্থানীয় কিছু লোকজন পোস্টটিকে মুসলিম বিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে স্থানীয় জনতাকে সংগঠিত করে অভিযুক্তর বাড়িসহ অন্যান্য হিন্দু বাড়িতে ভাঙচুর চালায়।

টাঙ্গাইলে ভূল স্বীকার ও ক্ষমা চাওয়ার পরও ফেসবুক পোস্টের জন্য হত্যা[৩৭]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্ম নিয়ে মত প্রকাশের জন্য হুমকি বা হামলার ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৩০ এপ্রিল ২০১৬, একটি জঙ্গি গোষ্ঠীর কিছু সদস্য টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলায় নিখিল জোয়ার্দার নামে একজন হিন্দু ব্যক্তিকে হত্যা করে। নিহত ব্যাক্তি ২০১২ সালে মহানবী (সাঃ) কে নিয়ে তার ফেসবুকে একটি আপত্তিকর পোস্ট দেয়। এরপরই জঙ্গি গোষ্ঠী কর্তৃক হত্যা হুমকি পাওয়ার পর নিখিল গ্রাম ছেড়ে আত্মগোপন করে। হত্যার শিকার হওয়ার কয়েকমাস আগে সে তার ফেসবুক পোস্টের জন্য ক্ষমা চায় এবং গ্রামে ফিরে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে শুরু করে।

ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার জন্য আটক[৩৮]

১১ নভেম্বর ২০২০, ফেসবুকে পোস্টে ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে আটক করে পুলিশ। গনমাধ্যম থেকে জানা যায় গত ২৩ অক্টোবর, ২০২০-এ উক্ত ছাত্রীর ফেসবুক পোস্টের কিছু স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়। ছাত্রীটি পোস্টটি লক্ষ্য করার সাথে সাথেই ২৫ অক্টোবর ২০২০ ঢাকার পল্লবী থানায় গিয়ে জানান যে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট

34.'Mayhem Over Facebook Post', The Daily Star, November 11, 2017, https:// www.thedailystar.net/frontpage/mayhem-over-facebook-post-1489402.
35. 4 killed, 100 injured: Borhanuddin Tturns into battlefield during rally organised by Tawhidi Muslim Janata', The Daily Star, October 21, 2019, https:// www.thedailystar.net/frontpage/clash-in-bhola-4-killed-100-injured-1816540.
36. Masud Amal, Comilla, 'Hindu Households Vandalised, tTorched in Comilla', Dhaka Tribune, November 1, 2020, https://www.dhakatribune.com/bangla-desh/ nation/2020/11/01/hindu-households-vandalised-torched-for-showing-supportto-france
37. Star Report, 'Tailor killed in Tangail, 'IS claims responsibility', The Daily Star, April 30, 2016, https://www.thedailystar.net/country/hindu-tailor-stabbed-dead-tangail-1216852
38. Star Report, 'Tailor killed in Tangail, 'IS claims responsibility', The Daily Star, April 30, 2016, https://www.thedailystar.net/country/hindu-tailor-stabbed-dead-tangail-1216852
39. Staff Correspondent , 'Hurting' religious sentiment: College girl held in Dinajpur',The Daily Star, October 30, 2020, https://www.thedailystar.net/ back-page/news/hurting-religious-sentiment-college-girl-minority-communityarrested-dinajpur-1986

হ্যাক করা হয়েছে। ২৫ অক্টোবর থানায় অবহিত করার জন্য বাসা থেকে বের হওয়ার পর পরিবার আর তার কোন খোঁজ পায়নি। ১১ নভেম্বর পুলিশ ধর্ম অবমাননাকর পোস্টের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করার ঘটনা জানায়।

ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে কলেজ ছাত্রী আটক[৩৯]

২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক কলেজছাত্রীর একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটে। ছাত্রীটি তৎক্ষনাত থানায় গিয়ে এই পোস্টের সাথে তার সম্পৃক্ততা অস্বীকার করে। পুলিশ অভিযুক্ত এবং গ্রামবাসীদের নিয়ে ঘটনাটির সমাঝোতা করে দেয়। কিন্তু একটি স্বার্থান্বেষী মহল স্থানীয় জনতাকে উত্তেজিত করে থানা ঘেরাও করে। এর প্রেক্ষিতে পুলিশ ডিজিটাল সিকিউরিটি মামলায় উক্ত তরুনীকে গ্রেফতার করে।

অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতভিত্তিক ঘৃন্য বিবৃতি/বক্তব্য

দলিত জনগোষ্ঠী হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন পর্যায়ের সামাজিক গোষ্ঠী এবং বর্ণপ্রথার কারণে আবহমান কাল থেকেই অস্পৃশ্য বা ঘৃণার বিষয়বস্তু হয়ে আসছে। যদিও তারা হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু তাদের প্রতি ঘৃণার চর্চা ব্যপকতার কারণে এই প্রতিবেদনে আলাদাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা জাত-পাতভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে যার সাথে হেটস্পিচ বা ঘৃণ্য বিবৃতি/বাক্যের ব্যবহার খুবই সাধারণ। দুর্ভাগ্যজনক হলো একদিকে তারা মুসলিমদের কাছ থেকে হিন্দু হিসেবে এবং অন্যদিকে বর্ণহিন্দুদের কাছে ছোটজাত হিসেবে ঘৃনামূলক আচরণের শিকার হয়ে থাকে। দলিতদের ভাষ্যমতে, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যখন কোন সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটে তখন দলিতরাই প্রথম এবং বেশি এর শিকার হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে প্রায় ৫.৫ থেকে ৬.৫ মিলিয়ন দলিত জনসংখ্যা রয়েছে এবং মোট হিন্দু জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগই এই দলিত জনসংখ্যা।[৪০] সাধারণত, দলিতরা সমাজের তথাকথিত নীচু ধরণের কাজ করে থাকে এবং তাদের পেশা ও বর্ণের কারণে অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দৃঢ়ভাবে অস্পৃশ্যতার সাথে যুক্ত। সামাজিক কোন নিয়ম বা প্রথার ব্যত্যয় ঘটালে দলিতদের বৈষম্যমূলক আচরণের সম্মুখীন হতে হয় যার সাথে ঘৃণা-প্রণোদিত আচরণ খুবই সাধারণ।

দলিতরা প্রথম যে ঘৃণামূলক আচরণের শিকার হয় তা হলো তাদের সবসময় পেশাসূত্রে অবজ্ঞাসূচক নামে ডাকা হয়, নিজস্ব নামে ডাকা হয় না। দলিতরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘৃণামূলক আচরণের সম্মুখীন হয়। দলিত পরিচয়ের কারণে ভর্তি প্রত্যাখ্যান, আলাদা বেঞ্চে বা মেঝেতে বসতে বাধ্য করা হয়। জোর করে স্কুলের ঘর, টয়লেট পরিষ্কার করানোর ঘটনাও স্বাভাবিক। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দলিত শিক্ষার্থীদের প্রায় ৩০ শতাংশের সহপাঠী এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে ঘৃণা-প্রণোদিত আচরণের অভিজ্ঞতা রয়েছে, ৬ শতাংশ শিক্ষার্থীকে আলাদা বেঞ্চে বসতে হয়েছিল। দলিতদের প্রতি ঘৃণামূলক আচরণের কিছু ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো -

- ২০১৬ সালে, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিকের ৩৫ জন দলিত শিক্ষার্থীকে স্কুলের হেডমাস্টার বলেন যে, তারা মুচির ছেলে তাই তাদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে জুতা মেরামত শিখলেই ভাল।

- ২০২০ সালে, বিরাট বাশফোর (৬) মৌলভীবাজার জেলার অগ্রদূত কিন্ডারগার্টেনে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল । কিন্তু সে দলিত হওয়ায় অন্য অভিভাবকরা তার ভর্তির বিরোধিতা করে। এক পর্যায়ে বিরাটের পিতা তাকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দেন।

- দলিত সম্প্রদায়ের আইনজীবী ছিলেন বাবুল রবিদাস জয়পুরহাট জেলার আদালতের ক্যান্টিনে নাস্তা করায় ক্যান্টিনের মালিক তাকে নতুন প্লেট, গ্লাস ও কাপ কিনে দিতে বাধ্য করে।

- গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার দলিত যুবক রাজেশ বাশফোর একটি

40. Ibid.

রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে দলিত পরিচয়ের কারণে রেস্তোরার মালিক তাকে বাইরে বসে খাবার খেতে বলেন। রাজেশ প্রতিবাদ করলে তাকে মারধর করা হয়। এই ঘটনায় প্রশাসন হস্তক্ষেপ করলেও জাতপাতভিত্তিক বৈষম্য মোকাবেলায় কোন আইন না থাকায় দলিতদের রেস্তোরায় সাধারণ সেবা নিশ্চিতে ব্যবস্থা নিতে না পারার কথা জানায়। বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই দলিতদের বাড়ি থেকে পাত্র এনে রেস্তোরার খাবার খেতে হয় অথবা তাদের কাগজে খাবার সরবরাহ করা হয়।

- ২০১৭ সালের মে মাসে দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার খানাসা বাজারে একজন সরকারি কর্মকর্তা হোটেল রেস্তোরায় বৈষম্যহীণভাবে দলিতদের খাবার গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেন। এর ফলে দলিতরা কয়েকদিন কোন বাধা ছাড়াই রেস্তোরায় খাবার গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই মিষ্টির দোকানের মালিকরা একত্রিত হয়ে ধর্মঘট ডাকেন।

অনেক স্থানেই দলিতদের সাধারণত হিন্দু মন্দির বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। পুরোহিতরা দূর থেকে দলিতদের হাতে প্রসাদ নিক্ষেপ করেন যাতে কারে তাদের সাথে শারীরিক সংযোগ না হয়। কোথাও কোথাও দলিতদের নিজস্ব মন্দির আছে কিন্তু উচ্চ বর্ণের পুরোহিতরা সেখানে কখনও পুজো পরিচালনা করেননা। ছোট জাত, মুচি, চামার, চাড়াল, চন্ডাল, মেথর ইত্যাদি নামেই দলিতদের সবজায়গায় সম্বোধন করা হয়।

জাতীয় নির্বাচনের সময় দলিতদের ভোট খুবই মূল্যবান তা ছাড়া নাগরিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের কোনো স্থান নেই। সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় দলিতরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু নির্বাচনের সময় অ-দলিত বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলিত প্রার্থীকে প্রতিরোধ করে। সেখানে তখন জনপ্রিয় স্লোগান হয়, 'মুচি ঠেকাও, সমাজ বাঁচাও' ।

আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে ঘৃণা/ বিদ্বেষমূলক বক্তব্য

বাংলাদেশে আহমদীয় সম্প্রদায় এক বিরূপ পরিবেশে অবস্থান করছে কেননা বেশিরভাগ ইসলামপন্থী দল তদের মুসলিম হিসেবে স্বীকার করে না এবং তাদেরকে অমুসলিম ঘোষনা করার জন্য সরকারের ওপর সবসময় চাপ সৃষ্টি করছে।[৪১] আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ হল তারা ইসলামের শেষ নবী (সাঃ) হিসেবে হযরত মুহাম্মদ কে স্বীকার করেন না। বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের বড় জোট হেফাজতে ইসলামের প্রধান মাওলানা শাহ আহমেদ শফি ২০১৯ সালের এপ্রিলে সরকারের কাছে আহমদীয়া সম্প্রদায়কে আনুষ্ঠানিকভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবী জানান।[৪২]

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ সূত্রে জানা গেছে, ১৯৬৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত

41. Stephan Uttom and Rock Ronald Rozario, 'Cleric Demands Bangladesh Ahmadis be Declared 'Non-Muslim", Union of Catholic Asian News, April 18, 2019, https://www.ucanews.com/news/cleric-demands-bangladesh-ahmadis-bedeclared-non-muslim/85004.
42. Stephan Uttom and Rock Ronald Rozario, 'Cleric Demands Bangladesh Ahmadis Be Declared 'Non-Muslim", Union of Catholic Asian News, April 18, 2019, https://www.ucanews.com/news/cleric-demands-bangladesh-ahmadis-bedeclared-non-muslim/85004#.

১৩ জন আহমদীয়া নিহত হয়েছে এবং ২০০০ সাল থেকে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপর প্রায় ১০০টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।[৪৩] গত বিএনপি শাসনামলে (২০০১-২০০৭) সরকার আহমদীয়াদের কিছু প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে এবং সেই সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু আহমদীয়া মসজিদ অবরোধ ও ভাঙচুর করা হয়। এছাড়া তাদের অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করে তাদের মসজিদে সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়া হয়। বিভিন্ন স্থানে আহমদীয়াদের উপর সাম্প্রতিক কিছু হামলা নিচে উল্লেখ করা হল।

- ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পঞ্চগড় জেলায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করা হয়। সেই সময় তারা একটি সম্মেলন ও জলসার আয়োজন করছিল।[৪৪] সম্মেলন বন্ধ করার জন্য ইসলামপন্থী তিনটি সংগঠন যৌথভাবে সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় এবং একই সাথে তাদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি তুলে ধরে। এক পর্যায়ে তারা সম্মেলন স্থলে হামলার চেষ্টা করলে পুলিশ প্রতিরোধ করে। এর প্রেক্ষিতে ইসলামপন্থী দলগুলোর লোকজন পঞ্চগড় সদর

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ আহমদীয়ারা একই ধরনের হামলার সম্মুখীন হয়েছিল নেত্রকোনা শহরে একটি নির্মাণাধীন মসজিদকে কেন্দ্র করে। উত্তেজিত জনতার আড়ালে একটি দল মসজিদটি ভাঙচুর করে। পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে প্রতিরোধ করতে গিয়েও ব্যার্থ হয়।[৪৫]

১৪ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মসজিদুল বায়তুল ওয়াহিদ নামে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর একটি মসজিদ আক্রান্ত হয়। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, স্থানীয় জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসার একদল ছাত্র মসজিদুল বায়তুল ওয়াহিদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে তারা স্থানীয় আরো কিছু মাদ্রাসা ছাত্রদের জড়ো করে হামলা চালায়। পরবর্তীতের তারা আহমদীয়াদের আইন করে অমুসলিম ঘোষনার দাবীতে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে।[৪৬]

আহমদীয়াদের ওপর এই বিক্ষিপ্ত হামলার পাশাপাশি তাদেরকে নিয়ে নানা ধরণের ঘৃণামূলক আচরণ অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের অমুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করে হয়রানি করা হচ্ছে। একজন ছাত্র জানিয়েছেন তার স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক সবসময় তার প্রতি অপমানসূচক শব্দ ব্যবহার করেন, কাফের হিসেবে সম্বোধন করেন। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতি এই ধরণের আচরণের ক্ষেত্রে সরকার অনেকটা 'ঝামেলায় না জড়ানোর' নীতি অনুসরণ করছে। একদিকে তারা যেমন ইসলামপন্থীদের দাবীকে পাত্তা দিচ্ছেনা অন্য দিকে অহমদীয়াদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতেও খুব একটা তৎপর নয়।[৪৭]

বিহারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য

বাংলাদেশে 'বিহারী' শব্দটি গালি বা নেতিবাচক হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিহারীরা মুসলিম হলেও তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতির কারণে আলাদা জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। তাদেরকে নিয়ে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হলো ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে তাদের বিরোধীতা এবং পাকিস্তানী বাহীনিকে হত্যাযজ্ঞে সহযোগিতা। স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকার কারণে তাদের দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এবং তখন থেকেই 'বিহারী' শব্দটি ঘৃণ্য হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে বাংলাদেশের ১৩ টি এলাকায় ১১৬

43. Tarek Mahmud, 'A history of repression', Dhaka Tribune, June 16, 2017, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/06/12/a-history-of-repression.
44. Sazzadur Rahman Sazzad, The Dhaka Tribune, '50 Ahmadiyyas injured iInjured in Co-ordinated attack on the community in Panchagarh', Dhaka Tribune, February 13, 2019, https://www.dhakatribune.com/ bangladesh/nation/2019/02/13/sunnis-attack-ahmadiyyas-in-panchagarh.
45. Staff Correspondent, 'Under-construction Ahmadiyya mosque vandalised in Netrakona', New Age, September 15, 2019, https://www.newagebd.net/article/84607/under-construction-ahmadiyya-mosque-vandalised-in-netrakona.
46. Staff Correspondent, 'Ahmadiyya mosque, houses attacked in Brahmanbaria, New Age, January 16, 2020, https://www.newagebd.net/ article/96747/ahmadiyya-mosque-houses-attacked-in-brahmanbaria.
47. Ibid

টি ক্যাম্পে (জেনেভা ক্যাম্প হিসেবেই বেশি পরিচিত) প্রায় ৩০০,০০০ অবাঙালি উর্দুভাষী বাস করছে।[৪৮] বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা দীর্ঘদিন 'আটকে পড়া পাকিস্তানী' হিসেবে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে এক দশক আগে পর্যন্ত তারা ছিল[৪৯] রাষ্ট্রহীন ।

স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকার জন্য এই সম্প্রদায়ের মানুষকে গভীর ঘৃণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল কয়েক দশক। বঞ্চিত হয়েছিল নাগরিক ও সরকারি সেবা থেকে। বিহারী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম। ক্যাম্প পরিচয়ের কারণে স্কুলে তারা নানামুখি বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে ঘৃণাবাচক সম্বোধন। 'বিহারীর বাচ্চা', 'রাজাকার', 'পাকিস্তানি'- এই শব্দগুলো উর্দুভাষী বিহারী শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনই শুনতে হয় সহপাঠি বা শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে। এই সম্প্রদায়ের খুব কম সংখ্যকই স্কুলে যায়, এবং যারা যায় তাদের এই ঘৃণাবাচক শব্দগুলো হজম করে শিক্ষাজীবন শেষ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন 'বিহারী' একটি শব্দ যা তাদের জীবনে স্থায়ী কলঙ্ক হয়ে দাড়িয়েছে। তাদের মতে, "আমাদের ঠিকানা থেকে আমাদের সহজেই চিহ্নিত করা যায় এবং পরিচয় উন্মোচিত হলে আমরা অন্যান্য নাগরিকদের দ্বারা অবহেলার শিকার হই। আমাদের জন্য সরকারী বা বেসরকারী সেবায় প্রবেশের সুযোগ বেশ সীমাবদ্ধ। 'বিহারী' পরিচয়ের কারনে আমাদের যে ধরণের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় তার ফলে 'বিহারী' শব্দটি আমাদের কাছে মানসিকভাবে পীড়াদায়ক হয়ে দাড়িয়েছে।' তাদের অনেকেই জানিয়েছেন যে, যখনই তারা তাদের বঞ্চনার অবসানের দাবী জানান তখনই বলা হয় ১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য এটা তাদের প্রাপ্য। সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রায়ই বিহারীদের ক্যাম্প থেকে উৎখাতের চেষ্টা করেন। ২০১৪ সালে মিরপুরের কালশী এলাকায় একটি বিহারী ক্যাম্পে স্থানীয়রা আগুন ধরিয়ে দিলে বেশ কয়েকজন জীবন্ত পুড়ে মারা যায় এর মধ্যে একই পরিবারের ৮ জন জীবন্ত দগ্ধ হন।[৫০]

তথ্যসূত্রঃ
South Asia State of Minorities Report 2021: Hate Speech against Minorities (ওয়েবসাইট লিংকঃ https://thesouthasiacollective.org/annual-reports/#2021)

লেখক মঞ্জুরুল ইসলাম একজন মানবাধিকার ও উন্নয়নকর্মী, যোগাযোগঃ manjur_nu@live.com এবং জাকির হোসেন, প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ।

48. Islamic Relief Bangladesh, Human Rights Situation of Urdu-speaking Community in Dhaka City 2016.
49. During the liberation war of Bangladesh in 1971 Bihari people opposed independence of Bangladesh and assisted Pakistani Military in genocide.
50. The Daily Star, '9 burnt dead, another gunned down', June 14, 2014, https:// www.thedailystar.net/9-burnt-dead-another-gunned-down-28447

প্রচলিত বৈষম্যমূলক রীতি-নীতি সংস্কারের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী

-মোঃ আবু নাছের মাসুদ

নারীর অধিকার মানবাধিকার। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেকক্ষেত্রে নারীকে অবমূল্যায়ন,অধঃস্তন হিসেবে বিবেচনা করার প্রবনতা এত বেশী যে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন যা একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ ও লৈঙ্গিক সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে, জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদ, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) সহ বিভিন্ন সনদের পক্ষভুক্ত হওয়া ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময় আইন প্রণয়ন করেছেন। যেমন-যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ (সংশোধিত ২০১৮), বাল্য বিবাহ আইন ২০১৭, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, ইত্যাদি। এছাড়া, সুপ্রীম কোর্টের হাইকার্ট বিভাগ সময়ে সময়ে বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছেন। এরমধ্যে, গত ১৪ মে ২০০৯ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট ১১টি দিক নির্দেশনা প্রদান অন্যতম।

নাগরিক উদ্যোগ একটি জাতীয়ভিত্তিক বেসরকারি মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে দীর্ঘদিন যাবত নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করে আসছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দাতা সংস্থা ডিগনিটি অ্যালিয়ান্স ইন্টারন্যাশনাল (ডাই) এর সহায়তায় 'ব্রেকিং দ্য নর্মস: চ্যালেঞ্জিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে (পীরগাছা সদর ইউনিয়ন, ইটাকুমারী, কান্দি ও অন্নদাগর ইউনিয়ন) ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে ৩০ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত এক বৎসর মেয়াদী একটি পাইলট প্রকল্প পরিচালনা করেছে।

এক্ষেত্রে, নারী ও শিশুদের প্রতি ঘটমান সহিংসতার ব্যাপকতা বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের কর্মএলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের নির্বাচিত এলাকায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বৈচিত্র্যময়, যেমন-ধর্মীয় সংখ্যালঘু, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী। পাশাপাশি, আমাদের দেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, ঘরে-বাইরে, হোক সেটা কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পাড়া-মহল্লা, সর্বক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ তৈরিতে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশে নারী ও শিশুরা যৌন সহিংসতা ও শোষণের বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠে, যেমন: শারীরিক আঘাত বা

হুমকি, যৌন নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, নিয়ন্ত্রণ বা আধিপত্য, ভয় দেখানো, অনুসরণ করা এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনা। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল, বিদ্যমান দায়মুক্তির সংস্কৃতি ও জেন্ডার এবং জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণাকে উপলব্ধি এবং সমাজের নারী-পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। আমাদের সমাজে সাধারণত সহিংসতার কারণে নারী ও শিশুদের ওপর যে মানসিক প্রভাব পড়ে তা উপেক্ষা করা হয়। এই প্রকল্পটি সহিংসতার শিকার হওয়া নারী ও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলোচনাকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশের নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত; এই প্রকল্প স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, মেডিকেল প্রফেশনাল, আইনজীবী, এনজিও ও গণমাধ্যমকর্মীসহ অন্যান্য অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে পরিচালিত হয়।

কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্প কর্ম এলাকায় নারী, শিশু নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কর্মশালা, কমিউনিটির সাথে কর্মশালা, ইউথ চেইঞ্জ ডিফেন্ডার ট্রেনিং, কিশোর-কিশোরীদের সাথে কর্মশালা, তৃণমূলে উঠান বৈঠক, অংশীজনদের সাথে সভা ও আঞ্চলিক সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভা, উঠান বৈঠক, কর্মশালা ও সেমিনারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় পর্যায়ে নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন, সহিংসতা ও বৈষম্য বিষয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি তা প্রতিকার ও প্রতিরোধে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করেন। তাদের আলোচনা থেকে বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের সরূপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যেমনঃ

নারী নির্যাতন:

নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা বন্ধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের পরও নির্যাতনের ঘটনা কমছে না বরং বাড়ছে। নাগরিক উদ্যোগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তৃণমূলে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নারীর প্রতি যে ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতা হয়ে থাকে তা তুলে ধরেন। তারা বলেন- যৌতুকের জন্য স্বামী ও তার পরিবারের সদস্য কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, মেয়ের জামাইয়ের চাকুরী/ব্যবসার জন্য যৌতুক দাবী, ছেলে সরকারী চাকুরী করে/প্রতিষ্ঠিত ছেলের সাথে বিয়েতে যৌতুক, স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষন না দেয়া, পরিবারে অভাব অনটনের কারণে নির্যাতন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব, স্বামী-স্ত্রীর পৃথক বসবাস (প্রবাসে থাকা), স্বামীর বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, জুয়া, পরকীয়া, মানসিক নির্যাতন, আর্থিক বৈষম্যের কারণে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও নির্যাতন, সাংসারিক কাজের চাপ, সন্তানের নেতিবাচক কর্মকান্ডের জন্য স্ত্রীকে দায়ী করার প্রবনতা, স্বামীর বহুবিবাহ, ছেলে সন্তান না হলে নির্যাতন ও তালাক দেয়া, পরিবারে ৩য় বক্তির হস্তক্ষেপ এবং বিভিন্ন ধরণের ইন্ধন দিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি করা, স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামী কর্তৃক যৌন নির্যাতন, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, মনগড়া ফতোয়া, রাস্তাঘাট-যানবাহনে নিরাপত্তাহীনতা, ফুটপাতে বসবাসরত মানসিক ভারসাম্যহীন ও অসুস্থ নারীর নিরাপত্তাহীনতা, নারীর আর্থিক অসচ্ছলতা, নারীর নিজ উপার্জনের ওপর নিয়ন্ত্রণের অভাব (বেতনের টাকার জন্য বাবা, ভাই ও স্বামীর পরিবারের সদস্যদের চাপ), বয়স্ক নারীদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অবহেলা, পারিবারিক, সামাজিক কুসংস্কার এবং ক্ষতিকর রীতি-নীতি, কর্মক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মী দ্বারা মানসিক ও যৌন নির্যাতন, কোভিড-১৯ এর কারণে অনেকে কাজ হারিয়ে বাসায় থাকায় মানসিক দ্বন্দ, ও পারিবারিক নির্যাতনের মাত্রা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়া উল্লেখযোগ্য।

নারীর প্রতি বৈষম্য:

যুগ যুগ ধরে নারীর প্রতি যে বৈষম্য চলমান তা নিরসনকল্পে দীর্ঘদিন ধরেই জাতিসংঘ ও বিভিন্ন দেশ সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে কার্যক্রমের মাধ্যমে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু বৈষম্য থেমে নেই। প্রকল্প কার্যক্রমের আলোচনায় তৃণমূলে ভুক্তভোগী, স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, নীতি নির্ধারকবৃন্দের আলোচনায় নারীর প্রতি বৈষম্য বিষয়ে তাঁরা বলেন, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে নারী ও মেয়ে শিশুদের প্রতি বৈষম্য, চলাফেরা, মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা না থাকা, বিয়ের পর নারীর ওপর নানা ধরণের অনাকাঙ্খিত বিধিনিষেধ আরোপ, বিধবা ও আর্থিকভাবে দুর্বল নারীদের উপর সামাজিক শোষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈষম্য, ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিত করা, স্থানীয় বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণে (প্রতিদ্বন্দিতা) পরিবার কর্তৃক বাঁধা দেয়া,

নারীর গৃহকর্মের মূল্যায়ন না করা, বিয়ের পর লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা ও ঠকানো, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানের কারণে নারী-শিশুর মধ্যে বৈষম্য তৈরি করা, নারী-পুরুষের মজুরীতে বৈষম্য, স্থানীয় সালিশ ও বিভিন্ন ফোরামে নারীদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে তেমন গুরুত্ব না দেয়া, নারীকে অবমূল্যায়ন, অসুস্থ হলে সময়মতো সঠিক চিকিৎসা করাতে অনীহা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যের শিকার নারীরা প্রতিনিয়ত হয়ে থাকেন।

সচেতনতার অভাব:

আমরা আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে বলে থাকি নারীরা বাংলাদেশের উন্নয়নের অংশীদার। নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আলোচনায় আলোচকদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নারী অধিকার বিষয়ে সমাজে সচেতনতার অভাব রয়েছে, এমনকি নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে বেশিরভাগক্ষেত্রে অসচেতন। বিষয়গুলো না জানার কারণে, কোন ধরণের আচরনগুলো নির্যাতনের আওতায় পরে সে সম্পর্কে এলাকাবাসীরও ধারণা নেই বললেই চলে। অনেকক্ষেত্রে ভুক্তভোগী/ক্ষতির শিকার নারীরা আইন ও সরকারি সেবা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে নির্যাতিত হলেও তারা কোথায় গেলে ঘটনাটির সুরাহা বা সহযোগিতা পাবেন তা না জানার ফলে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন না। তারা বলেন, প্রকল্প কর্মএলাকায় ইতোপূর্বে এধরণের কোন কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি তাই তারা এসব বিষয়ে তেমন জানেন না।

বাল্যবিবাহ:

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেশে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ের হার ২০২১ সালে আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। কোভিডের প্রাদুর্ভাবে ওই দুই বছর এই বয়সী প্রায় ২৭ শতাংশ মেয়ের

বিয়ে হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় বাল্যবিবাহ বিষয়ে তাঁরা বলেন- মেয়েদের মতামত ছাড়া জোরপূবর্ক বিয়ে দেয়া হয়, মেয়েদের বেশিরভাগ পরিবার বোঝা মনে করে, বিয়ে দিয়ে অভিভাবকের দায় মুক্তি, সচেতনতার অভাব, সামাজিক চাপ, আইনের সঠিক প্রয়োগ না হওয়া, যৌন হয়রানি ও মানসম্মানের ভয়, প্রেমের মাধ্যমে পালিয়ে বিয়ে, আর্থিক অসচ্ছলতা, ধর্মান্ধতা, মা-বাবার মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকা,ভূয়া জন্ম সনদ প্রস্তুত করে বয়স বাড়িয়ে দেয়া, চাকুরিজীবি ও প্রতিষ্ঠিত পাত্রের সন্ধান পেলে বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করা হয়। অনেক সময় বয়স কম হওয়ার কারনে বিয়ে রেজিস্ট্রি করা হয় না।

শিশু নির্যাতন:

প্রতিদিন বিভিন্ন মাধ্যমে শিশু নির্যাতনের চিত্র উঠে আসছে। এর বাইরেও অনেক ঘটনা আড়ালে থেকে যায়। অনেক সময় নিরপরাধ শিশুরা খুন, ধর্ষণ কিংবা ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এসব ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দৃষ্টান্ত খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। অনেক সময় ভূক্তভোগী আইনের আশ্রয় নিলেও অপরাধী আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে ছাড়া পেয়ে যায়। করোনা মহামারিতে মানুষ যখন বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে, তখনও শিশুর প্রতি নির্যাতন, সহিংসতা বন্ধ হয়নি বরঞ্চ বেড়েছে। নাগরিক উদ্যোগ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে শিশুর প্রতি নির্যাতনের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলে তারা বলেন- জন্মের পূর্বেই ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে পার্থক্য করা হয়, স্কুল/মাদ্রাসায় শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতনের শিকার, কর্মস্থলে নির্যাতন (দোকান,গৃহ শ্রমিক, ইট ভাটা ইত্যাদি), মা-বাবা চাকুরী করায় সন্তানের একাকিত্ব, পরিবারে সৎ মা/বাবা কর্তৃক নির্যাতন, নিজ পরিবারের সদস্য দ্বারা মানসিক, শারীরিক ও যৌন নির্যাতন, শিশুদের শিক্ষা ও যত্নে অভিভাবকের উদাসীনতা, বাবা-মা উভয়ে কর্মজীবী হওয়ায় শিশুর লালন-পালন ব্যহত হয়।

'ব্রেকিং দ্য নর্মস: চ্যালেঞ্জিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন'

শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (পাইলটিং) কার্যক্রম পরিচালনাকালীন কর্মএলাকায় নারী ও শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় উন্নয়ন সহযোগী ডিগনিটি এলিয়ান্স ইন্টারন্যাশনাল (ডাই) এর PR3 (Prevention, Response, Rehabilitation, Reforming System) মডেল অনুসারে কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। অর্থাৎ এ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী অংশীজনবৃন্দের আলোচনার প্রেক্ষিতে নারী ও শিশুদের প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার প্রচলন বন্ধে যে সকল সুপারিশ উঠে এসেছে PR3 মডেলের আলোকে সেগুলোকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়-

প্রতিরোধ (Prevention):

- স্থানীয় এলাকার গ্রাম/ওয়ার্ডে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, ইমাম, সাংবাদিক, পুরোহিত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে কার্যকর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

- স্থানীয় পর্যায়ে নারী ও যুব সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

- স্বামী-স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ একে অন্যকে সহযোগিতা ও সমন্বয় করে সংসার পরিচালনার পাশাপাশি সহমর্মী আচরণ করতে হবে। নারীর কাজের যথাযথ মূল্য ও সম্মান দিতে হবে।

- যৌতুকের কুফল বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি কোন এলাকায় কীভাবে যৌতুক (সমাজ/পরিবারে) আদান-প্রদান করা হয়, সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং ও এর ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

- অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যে দুরত্ব তৈরি না করে যত্নশীল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতে হবে। সন্তানরা যাদের সাথে মিশে, আড্ডা দেয়, সে সকল বন্ধু এবং তাদের সময় কাটানোর স্থানগুলো সম্পর্কে অভিভাবকদের জানতে হবে।

- শিশুদের মূলবোধ ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে।

- বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর বিষয় ও দেশে প্রচলিত এ সংক্রান্ত আইন বিষয়ে শিশু ও অভিভাবকদের বোঝাতে হবে।

- স্কুল পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের মোবাইল ও অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত করতে হবে।

- বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ফোরামে বাল্য বিবাহ ও সামাজিক সমস্যাসমূহের প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করার উদ্যোগ নিতে হবে।

- নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ বন্ধে সরকারী বিভিন্ন হটলাইন নাম্বারসমূহ ব্যবহার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে হবে ও এবিষয়ে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, উঠান বৈঠক, লিফলেট (তথ্যবহুল), পোস্টার, বিল বোর্ড স্থাপন করতে হবে।

- স্কুল/মাদ্রাসায় (জুনিয়র ও হাইস্কুল) বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন বন্ধে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সাথে নিয়ে ক্যাম্পেইন করতে হবে।

- যে সকল পরিবারে মা-বাবা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা শিশুদের নির্যাতন করেন তাদের চিহ্নিত করে কাউন্সেলিং করতে হবে।

- নির্যাতন বন্ধে পরিবারের ভাকাঙ্খীদের মূল ভূমিকা পালন করতে হবে।

- শিশুদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য খেলাধুলা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার (বিতর্ক, অংকন, রচনা প্রতিযোগিতা) ব্যবস্থা করতে হবে।

- নারী শিক্ষার পাশাপাশি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

- নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রতিক্রিয়া (Response):

- উপজেলা পর্যায়ে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের তথ্য ও সহায়তা প্রদান করা হবে। তথ্যকেন্দ্রগুলি ভিকটিম, ডিফেন্ডার, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি মিটিং পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবে।

- প্রগতিশীল ও সংস্কারপন্থী আইনজীবীদের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী আইনি সহায়তা প্রদান করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত জেলা আইনি সহায়তা সংস্থার কাছে প্রয়োজনে মামলা রেফার করতে হবে।

- নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবেলার জন্য স্থানীয় সরকারের (ইউনিয়ন পরিষদ) স্থায়ী কমিটির সাথে সম্পর্ক স্থাপন, অভিযোগ নথি ভুক্ত করণ এবং পরবর্তী প্রয়োজনে স্থানীয় থানা থেকে সহায়তা নিতে হবে।

পূনর্বাসন (Rehabilitation):

- নারীদের বিভিন্ন কার্যক্রমে (চাকুরী, সালিশ, সাংগঠনিক কার্যক্রমে যুক্ত করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নির্বাচনে অংশ-গ্রহণ) অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

- সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

- নারী ও শিশুদের বিষয়ে দেশের বিদ্যমান আইন, নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে।

- তৃণমূলে নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও অর্থনৈতিক

স্বাবলম্বিতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া;

- আর্থিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের তালিকা তৈরি ও সহযোগিতার জন্যে কাজ করতে হবে।
- জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন এবং আইসিটি বিষয়ে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।
- নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্থ নারী-শিশুদের সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিতে হবে।

সংস্কার (Reforming System):

- চাহিদার নিরিখে বিদ্যমান আইন, নীতিমালা এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে।
- দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ, বাস্তবায়ন ও নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার মাধ্যমে ডাটা সংরক্ষণ, অগ্রগতি পর্যালোচনা ও তৃণমূলের সমস্যা নিয়ে নীতিনির্ধারকদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করতে হবে।
- নারী-পুরুষের মজুরী বৈষম্য বন্ধ করতে হবে।
- পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে নারী-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে করণীয় বিষয়সমূহ যাতে লিপিবদ্ধ ও পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করা হয় সেবিষয়ে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- এফিডেভিট/নোটারী পাবলিক এর মাধ্যমে বয়স বা স্বামী-স্ত্রীরূপে একসাথে বসবাসের ঘোষণার বৈধতা সংক্রান্ত জটিলতা ও এর নেতিবাচক প্রভাব (যেমন: বাল্য বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, ভরণপোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা) বিষয়ে ক্যাম্পেইন করতে হবে।
- সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা এবং আইন সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারণা চালাতে হবে।
- ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি না করে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধ এবং একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এ ধরণের প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকল্পের অংশীজনদের সুপারিশ মতে, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলে ব্যাপক সু-বিধা-বঞ্চিত মানুষ অধিকার সচেতন হবে। সহিংসতা বন্ধ করে নারী-শিশুর যথাযথ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি থেকে বিভিন্ন নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি প্রচলিত বৈষম্যমূলক রীতি-নীতির প্রতিরোধ ও এধরণের ঘটনায় যথাযথ প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের জন্য যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, এছাড়া, বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার সীমাবদ্ধতা, প্রায়োগিক জটিলতা খুঁজে বের করে সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী।

লেখক মানবাধিকার সংগঠন নাগরিক উদ্যোগ-এর উর্ধ্বতন কর্মসূচী কর্মকতা,
যোগাযোগঃ anasher75@yahoo.com

সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও নারীদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়নে করনীয়

- এএলআরডি কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন সেমিনারে উত্থাপিত প্রতিবেদন

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং নারীর অধিকার, বঞ্চনা ও নিরাপত্তা বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত। সেই সাথে সহিংসতার মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। দেশভাগের পর পাকিস্তান সরকার আমলেও ভূমির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে কোনো টেকসই ও সমতাভিত্তিক সংস্কারের উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। বরং, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পত্তিকে কালো তালিকাভুক্ত করে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টির মাধ্যমে এক লক্ষেরও অধিক পাহাড়ি আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজ ভিটে-মাটি হারিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু তাই-ই নয় নারীদের উপর ক্রমাগত নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছে। তা সে পারিবারিক নির্যাতন বা সামাজিকভাবে নির্যাতন যেখানেই বলা হোক।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ:

আমরা জানি, সাম্প্রদায়িক বিভাজন নীতির উপর ভর করে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম, সেই রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী এর জন্মলগ্ন থেকে পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান)-কে তাদের উপনিবেশ বিবেচনায় বিজাতীয় শাসন ও শোষণকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদ চাপিয়ে দিয়েছিল। আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তাও ৫০ বছর হয়ে গেল। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার' নিশ্চিত করার যে কথা বলা হয়েছিল তা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলো না। দেশের ধর্মীয়, জাতিগত সংখ্যালঘু ও অদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনে তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। অপমান, লাঞ্ছনা, নিরাপত্তাহীনতা, মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা আজও সংখ্যালঘু জনজীবনকে আতঙ্কিত করে তুলছে। বারংবার সংখ্যালঘু-আদিবাসী সম্প্রদায় ভয়াবহ সম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হচ্ছে যার কোনো যথাযথ বিচার মেলে না। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশের আওতায় জারীকৃত শত্রু সম্পত্তি আইনকে তারা এক্ষেত্রে ফলপ্রদ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। স্বাধীনতার

পরবর্তী পর্যায়ে এই শত্রু সম্পত্তিকেই অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে শতকরা ২৮ ভাগ মানুষ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। কিন্তু সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে তা নেমে আসে শতকরা ৮ ভাগে।

বর্তমান সময়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের একটি পরিচিত কৌশল হচ্ছে ফেসবুকে মিথ্যা স্ট্যাটাস দিয়ে ধর্মীয় অবমাননা করা হয়েছে এই অজুহাতে সংখ্যালঘুদের বাড়ী ঘরে হামলা করা, আগুন লাগানো ইত্যাদি। পাবনার সাঁথিয়া (২০১৩ সাল), কক্সবাজারের রামু (২০১২ সাল), ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসিরনগর (২০১৬ সাল) সব ক্ষেত্রে একই ধরণের গল্প তৈরীর প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। করোনাকালীন লক-ডাউনের মধ্যেও ভোলার মনপুরায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে প্রায় ১০ টি হিন্দু বাড়ী-ঘর ভাংচুর করা হয় এবং কথিত হিন্দু যুবককে গ্রেফতার করা হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যার নামে ফেসবুকে কথিত স্ট্যাটাস দেয়ার কথা বলা হয় পুলিশ তাকেই গ্রেফতার করে এবং বেশিরভাগ ঘটনার তদন্ত শেষ হয়না এবং মিথ্যা স্ট্যাটাস দিয়ে সাজানো নাটকের হোতা প্রকৃত অপরাধীরা কখনোই আইনের আওতায় আসেনা। এ ধরনের ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগ, তারা নিরাপরাধী হয়েও লম্বা সময় জেল খেটেছে কিংবা নিখোঁজ হয়েছেন। নাসিরনগরের রসরাজ, রামু'র উত্তম বড়ুয়া এবং রংপুরের টিটু রায়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সর্বশেষ সুনামগঞ্জের শান্না ও খুলনার রূপসার ঘটনা তারই নিকৃষ্ট উদাহরণ মাত্র।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ও আক্রমণের চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো সংখ্যালঘু নির্যাতনের বেশি ঘটনা ঘটে নির্বাচনকালীন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭০-এর নির্বাচনে তৎকালীন আওয়ামীলীগের জয় লাভ এবং অতঃপর ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে পাক-বাহিনীর নির্বিচারে সংখ্যালঘুদের ওপর হত্যাযজ্ঞ; ১৯৯০-এর অক্টোবরে আবার আক্রান্ত হয় সংখ্যালঘুরা, উদ্দেশ্য দেশের গণ-আন্দোলন স্থবির করা; ২০০১-এর নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার শিকার হয় এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তখন সিরাজগঞ্জের ও ভোলার পূর্ণিমা-সীমার ধর্ষণ পরবর্তী আহাজারি কেউ শোনেননি বা শোনার প্রয়োজনও বোধ করেনি। অতঃপর ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন পরবর্তী হামলার ঘটনাও সুবিদিত। ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবি করা হয়েছিল আমরা ভোটের অধিকার চাইনা আমাদের নিরাপত্তা দিন। ২০০৮ সালের নির্বাচন পরবর্তী সে রকম সাম্প্রদায়িক হামলা না হলেও ২০১৪ সালে তা আবার ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের পি.ও ২৯/৭২ জারি করে শত্রু সম্পত্তি দেখভালের ভার ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হতে বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ, ১৯৬৯ সালের এই অধ্যাদেশ বাতিল করলেও একই সাথে Vested and Non-resident property (Administration) Act 1974 (Act XLVI of 1974) নামক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ইতোপূর্বে সরকারের কাছে থাকা শত্রু সম্পত্তিকে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে অভিহিত করে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারের হাতেই রেখে দেন। বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আপীল বিভাগ একাধিক রায়ে বলেন, "শত্রু সম্পত্তি আইন একটি মৃত আইন, এর ভিত্তিতে নতুন করে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা করা বেআইনী।" অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতসহ দেশের প্রথিতযশা গবেষকদের গবেষণা থেকে আমরা জেনেছি ১৯৬৫ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত মোট ২৭ লক্ষ্য হিন্দু খানা-র মধ্যে ১২ লক্ষ হিন্দু খানা-র মোট ২৬ লক্ষ্য একর ভূমি হারিয়েছে আর সেই সাথে হারিয়েছে স্থানান্তরযোগ্য অন্যান্য সম্পদ।

সরকার ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন সংসদে পাশ করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু আইনটি কার্যকর হয়নি। ২০০২ সালে তদানীন্তন জোট সরকার ক্ষমতাসীন হলে এক সংশোধনীর মাধ্যমে আইনটিকে স্থগিতকরণ করে চলমান সংখ্যালঘু নিপীড়ণের ধারা অব্যাহত রাখে। সবশেষে ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের কয়েকটি সংশোধনী পাস হওয়ার মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তির তফসিল বাতিল করা হয় এবং তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। এতে মাঠ পর্যায়ে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটলেও এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের কারণে এখনো অর্পিত সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ অধিকাংশ সংখ্যালঘু পরিবার অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে প্রতিকার পায়নি। আপীল ট্রাইব্যুনাল থেকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পনের রায় দেয়া হলেও অধিকাংশ জেলা প্রশাসক তা বাস্তবায়ন করছেন না। যদিও আইনে এই রায় কার্যকরের জন্য ৪৫ দিনের সময়সীমা বেধে দেয়া আছে। এছাড়াও হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে যে, আপীল ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

আদিবাসীদের অধিকার ও নিরাপত্তাহীনতা

সরকারি হিসেবে দেশে আদিবাসীদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ বলা হলেও এ সংখ্যা বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি। এদের দুই-তৃতীয়াংশের বাস সমতলে। পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০-এ আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি স্বত্ব ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টির স্বীকৃতি থাকলেও পার্বত্য তিন জেলা বাদে দেশের অন্য অংশে প্রথাগত ভূমি স্বত্ব ও ব্যবস্থাপনার আইনগত স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও এখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি। আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন নং ১০৭-এ বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ও কৃষিতে অভিগম্যতার পরিস্থিতি তাই মোটেই সুখকর নয়। বরং বাংলাদেশের

আদিবাসী জনগণ ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পূর্ণ হলেও দেশের আদিবাসী জনগণের এ বঞ্চনা নিরসনে সমন্বিত নীতি, কর্ম-পরিকল্পনা, কর্মসূচি বা উদ্যোগের কোন বিকল্প নেই। আদিবাসীদের অনুকূলে উল্লেখযোগ্য যেসব রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার বাস্তবায়নও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা বাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে প্রশাসনের একাংশের অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতিময়তার কারনে। ১৯৯৭ সালের সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির মূল অংশ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিতে কার্যত কোনো অগ্রগতি নেই বরং ভূমি বিরোধের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে এবং পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে আছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১-এর কাঙ্খিত সংশোধনী ২০১৬ সালে গৃহীত হলেও বিধিমালার অনুপস্থিতি, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, লোকবল ও বাজেটের অভাবে কমিশন কার্যকর কোনো ভূমিকা এখনো পালন করতে পারছে না। অনগ্রসর পার্বত্য অঞ্চলের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হলেও পাহাড়ের আদিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় তার তেমন ভূমিকা নেই। সমতলের আদিবাসীদের জমি জায়গা যাতে বেদখল না হয়, তার জন্য ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৭ ধারায় বিশেষ বিধানাবলী রয়েছে। সমতলে আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সংক্রান্ত এটিকেই একমাত্র আইনী রক্ষাকবচ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখনো তা অনুসরণ করা হচ্ছে না।

সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকা, সংবেদনশীল নীতি ও আইনের অপর্যাপ্ততা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে আদিবাসীদের প্রান্তিক অবস্থানের কারণেই মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের জেলাগুলিতে আদিবাসীদের জায়গাজমি থেকে তাদের উচ্ছেদ ও বেদখলের ঘটনা একের পর এক ঘটেই চলেছে। এছাড়া আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য সমন্বিত নীতি ও কর্ম-পরিকল্পনার অভাব, পার্বত্য চুক্তি ও আইনের অবাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি সরকারের নিরাপত্তাবাহিনীসহ বিভিন্ন সরকারি এজেন্সির প্রতিনিধিদের অসংবেদনশীলতা ও পক্ষপাতমূলক আচরণও এসব ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ। আদিবাসীরা ঐতিহ্যগতভাবে যেসব ভূমির মালিক, সেখানে তাদের মালিকানা অস্বীকার করা হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত তাঁর 'পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ আনপিপলিং অফ ইন্ডিজিনাস পিপলস: দ্য কেইস অফ বাংলাদেশ' শিরোনামের গবেষণা গ্রন্থে (২০১৬) দেখিয়েছেন, ১৯৫১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৬৪ বছরে সমতলের ১০টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ২ লাখ ২ হাজার ১৬৪ একর জমি কেড়ে নেয়া হয়েছে, যার দাম প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। একই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, ২৭ বছর আগে (১৯৮৯ সালে) পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের অনুপাত ছিল ৭৫ শতাংশ, এখন (২০১৬) তা ৪৭ শতাংশ। পাহাড়িরা হারিয়েছে ভূমি-বনাঞ্চল আর আমদানি করা সেকুলার বাঙালিরা দুর্বৃত্ত আমলা প্রশাসনের যোগসাজশে তা দখল করেছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা:

বিশ স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের যেসব দেশে স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার বেশি, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। দেশের ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের ৫০ শতাংশই জীবনে কখনো না কখনো সঙ্গীর হাতে শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে আলাদাভাবে করোনা মহামারির মধ্যে সর্বশেষ ১২ মাসে স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নারীর শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ তালিকায়ও ১৬তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। করোনাকালে দেশে ২৩ শতাংশ নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

সাম্প্রতিককালে পত্রিকার পাতা কিংবা সামাজিক মাধ্যমগুলোতে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধির প্রবণতা আমাদের চিন্তিত করে তুলেছে। প্রতিদিন একে পর এক নৃশংস ঘটনা ঘটেই চলেছে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ ব্যাপারে যতই সরব, ঠিক উল্টো চিত্র পাওয়া যায় রাষ্ট্রতন্ত্র যারা পরিচালনা করছে, তাদের কাছ থেকে। প্রতিদিনই আমরা দেখছি নারী ঘরে, বাইরে কর্মস্থলে, বাসে, ট্রেনে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। শুধু তাই নয় নির্যাতনের পর তাকে হত্যাও করা হচ্ছে। এসব ঘটনার পরও সুষ্ঠু ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। বিচারহীনতার সংস্কৃতি আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। অভিযুক্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে প্রভাবশালী হলে তার বিরুদ্ধে পুলিশ, প্রশাসন, তদন্ত সবই যেন অকার্যকর, অসহায়। বিচার প্রক্রিয়াও শেষ পর্যন্ত কার্যকর থাকে না। মানবাধিকার সংস্থা- আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান (২০১৬-২০২০) থেকে জানা যায়- পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ৩ হাজার ৫৮৭ নারী ধর্ষনের শিকার হয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমি দখলের হাতিয়ার হিসেবেও নারীর প্রতি সহিংসতাকে বেছে নেয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মহিলা আইনজীবী সমিতির এক জরিপে বলা হয়েছে নানা কারণে ধর্ষণ মামলার ৯০ শতাংশ আসামি খালাস পেয়ে থাকে। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রশাসনে দলীয় লোক থাকার কারণে এসব ঘটনার অপরাধীরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় পার পেয়ে যাওয়ার আরেক কারণ। এছাড়া ফৌজদারি আইনের দুর্বলতার কারণে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হয় না। এ বিষয়ে জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আইন প্রয়োগের অভাবে এখানে ধর্ষণ মহামারি রূপ নিয়েছে। তাই রাষ্ট্রের পাশাপাশি আইনের প্রয়োগে জনতার অংশগ্রহণ ও সামাজিকভাবে নারী নির্যাতনকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশমালা:

ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী এবং নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও তাঁদের নিরাপত্তাহীনতা দূর করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ তুলে ধরতে চাই-

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি অধিকার:

১. সকল ধরনের সাম্প্রদায়িক ঘটনা তদন্ত ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে এবং কমিশনকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করে এ সংক্রান্ত আইন প্রণনয় করতে হবে।

২. অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত রিট পিটিশন নং ৮৯৩২/২০১১-তে দেয়া উচ্চ আদালতের ৯ দফা নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. যে সকল ক্ষেত্রে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত ভুক্তভোগীদের পক্ষে রায় ও ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা দ্রুত কার্যকর করতে হবে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র মোতাবেক আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর জনস্বার্থবিরোধী রিট না করার বিষয়ে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত পরিপত্র জারি করতে হবে,

৪. অর্পিত সম্পত্তির আওতায় ২০১৩ সালে বাতিল হওয়া 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির খাজনা নেবার ক্ষেত্রে তহসিল অফিসের অস্বীকৃতি এবং এসি (ল্যান্ড) অফিসের গড়িমসি ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

আদিবাসীদের ভূমি অধিকার:

৫. সরকারের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য তাদের আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে;

৬. কৃষিজমি, বন, পাহাড় রক্ষা এবং ভূমিতে আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে, বিশেষ করে পার্বত্য এলাকার ভূমি বিরোধের দ্রুত ও কার্যকর নিষ্পত্তি করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে যথাযথ ভাবে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় জনবল এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. সমতলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সুরক্ষায় আদিবাসী ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।

৯. রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ১৭ ধারার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। বেদখল হয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধার ও প্রকৃত আদিবাসী মালিক বা তাঁর উত্তরাধিকারীকে ফেরত প্রদানের যে কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতার বিধান রয়েছে তা কার্যকর করতে হবে।

আদিবাসীদের ভূমি অধিকার:

১০. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

১১. সুষ্ঠু রাজনৈতিক চর্চা নিশ্চিত করাসহ বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং রাষ্ট্র ও বিচার বিভাগকে এ লক্ষ্যে একযোগে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

১২. মিডিয়া ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নারী ও শিশুর প্রতি অবমাননাকর বক্তব্যের পরিবর্তে নারী/কন্যা সন্তানকে একজন মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে।

১৩. জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষানীতি ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে জেন্ডার ও মানবাধিকার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৪. দেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলে আদিবাসী, সংখ্যালঘু, দলিত ও ভূমিহীনসহ যে সকল নারী ও শিশু, কিশোরীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটে চলছে তার তদারকির জন্য জেলা পর্যায়ে সরকারী উদ্যোগে বিশেষ কমিটি গঠন এবং চলমান মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ত্বরান্বিত করতে হবে।

উপরোক্ত দাবিগুলি পুরণের লক্ষ্যে সরকার ও প্রশাসনের উপর ব্যাপক জনমত ও জনচাপ সৃষ্টি একান্ত জরুরি। তার জন্য পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের গণস্বাক্ষর অভিযান, সভা, মানববন্ধন, মিছিল, সমাবেশ, গণশুনানী, গণ অবস্থান ইত্যাদি কর্মসূচি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। গণ আন্দোলন এবং গণসংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবল দরিদ্র, ভূমিহীন, সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও নারী সমাজসহ প্রান্তিক সকল জনগোষ্ঠীর দাবি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

-অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), ভূমি অধিকার রক্ষা ও ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি নীতি নির্ধারণী, এ্যাডভোকেসি এবং নেটওয়ার্কিং সংস্থা।

নগরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি : উত্তরণের উপায়

-মোঃ বকুল হোসেন

প্রসঙ্গ কথা:

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০১১ এর মূল স্লোগান হলো, সুস্বাস্থ্য উন্নয়নের হাতিয়ার। এই স্বাস্থ্য নীতির প্রারম্ভিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'স্বাস্থ্য মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত'। কিন্তু যখন শুধু পেশাগত কারণেই কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানুষ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে, মানবসম্পদ তথা সার্বিক উন্নয়নই ব্যাহত হয় বৈকি ! বাংলাদেশে দলিত সম্প্রদায় এরকমই একটি জনগোষ্ঠী, যারা নিজেদের পেশার কারণেই প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্যঝুঁকির সাথে লড়াই করছেন। বিভিন্ন আইন ও নীতিমালায় বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বাস্তবে এর কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তথ্য অনুযায়ী (15th world Congress on occupational Safty & Health), বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর পেশাগত কারণে মৃত্যুবরণ করেন ২০ লক্ষ ৩৪ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। এর মধ্যে শুধু ৩ লক্ষ ২১ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর পেশাক্ষেত্রে মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত আর বাকী ১৭ লক্ষ ১৩ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর মৃত্যুর কারণ হলো পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যা। এই পরিসংখ্যান স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ বা কর্মপদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করতে আমাদেরকে বাধ্য করে।

বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকির প্রচলিত ধারণা :

পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশে এ যাবৎ যতটুকু কাজ হয়েছে তা মূলত শিল্প কারখানাগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে। আর পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকির আলাপ-আলোচনার মূল মনোনিবেশকেন্দ্র মূলত অবকাঠামো নির্মাণ খাতের কর্মপরিবেশ এবং পোশাক-কারখানা বা চামড়া শিল্পের শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ কেন্দ্রিক। কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে ময়লা অপসারণের কাজে নিয়োজিত হাজার হাজার পরিচ্ছন্নতাকর্মীর স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে কোনো গবেষণা বা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয় না।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ:

পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যতম শিকার হচ্ছেন সনাতন পদ্ধতিতে বর্জ্য অপসারণের কাজে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীগণ। এটা অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়েছে যে, শুধু দলিতরা পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করবে। ইন্টারন্যাশনাল দলিত সলিডারিটি নেটওয়ার্ক এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে

বর্তমানে দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মানুষ প্রায় ৬৫ লক্ষ এবং এর মধ্যে কর্মক্ষম মানুষের অর্ধেকের বেশি পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে কর্মরত। বৃটিশ শাসনামলে ভারত থেকে বাংলাদেশে দলিত সম্প্রদায়ের অনেক মানুষকে নিয়ে আসা হয়। উদ্দেশ্য ছিল বার্মার (বর্তমানে মায়ানমার) দস্যুদলের আক্রমণে নিহত লাশ সরানোর কাজে নিযুক্ত করা। সেসময় থেকেই তারা এদেশে বসবাস করছে। বর্তমানে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলা সদরের মোট ২৭টি কলোনিসহ সারা দেশেই এই জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস এবং মূলত শহরবাসীর সৃষ্ট ময়লা তারা প্রতিদিন পরিষ্কার করছে (Manul Scanvenging : An Inhuman Occupation, by Zakir Hossain, Abul Baser & David Raju)।

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। যার ফলে শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ ভবনে পয়ঃনিষ্কাষণের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আছে। তবে যে গতিতে শহরাঞ্চলগুলোর স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে সে গতিতে গ্রামাঞ্চলের স্যানিটেশন ব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটেনি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও উন্মুক্ত টয়লেটের প্রচলন রয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর টয়লেটের ট্যাংকি ভর্তি হয়ে যাবার ফলে সেগুলো খালি করাসহ বর্জ্য অপসারণের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিযুক্ত করা হচ্ছে, যারা দলিত জনগোষ্ঠীর। এই পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বেশিরভাগই সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মী নন, এদেরকে মূলত মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হয়। এই কাজে দলিত কর্মীরা হাতে-পায়ে-মুখে কোনো ধরনের সুরক্ষা ছাড়াই নিজের হাত ব্যবহার করে মনুষ্য বর্জ্য অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনার কাজটি করে থাকেন। এ পদ্ধতি স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায় (পারভেজ, আলতাফ ও মাজহারুল ইসলাম; বাংলাদেশের দলিত সমাজ : বৈষম্য, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতা; অক্টোবর ২০১৪; নাগরিক উদ্যোগ ও বিডিইআরএম), ৫৪ শতাংশ দলিত অংশগ্রহণকারী তাদের বসবাস স্থানের আশেপাশে কোনো সরকারি হাসপাতাল নেই বলে জানিয়েছেন। দলিত কলোনীগুলোতে বসবাসকারীদের জন্য গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজ, ঝাঁড়ফুকই মূল ভরসা। তাছাড়া, ২০.৬ শতাংশ দলিত বলেছেন যে পরিচয়ের কারণে তাদের চিকিৎসা পেতে সমস্যা হয়। সিটি কর্পোরেশন বর্জ্য নিষ্কাশন পরিকল্পনার অধীন পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাঝে বিভিন্ন সুরক্ষাসামগ্রী যেমন- মাক্স, গ্লাভস, জুতা ও এপ্রোন বিতরণ করে। কিন্তু সেগুলো পরিমানে যথেষ্ট নয়, বারংবার ব্যবহারের ফলে নষ্ট হয়ে যায়, পুনরায় দেওয়া হয় না। এমনকি অনেকে একবারও সামগ্রীগুলো পান নি। আবর্জনা পরিষ্কার এবং বাছাইকালে কোনো সুরক্ষাসামগ্রী ব্যবহার না করার ফলে অসতর্কতাবশত হাত ও পায়ের বিভিন্ন অংশ কেটে গিয়ে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে, তারা দীর্ঘদিনের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটি গবেষণায় (A study on Occupation Health & Safty of Dalit,s in Bangladesh-2013, by Nagorik Uddyog and Safty & Rights society) অংশগ্রহণকারী পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বেশিরভাগই (৯৪%) কোনো না কোনো সময় বিভিন্ন অসুস্থতার শিকার হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে সর্দি-কাশিসহ জ্বরে ৭০%, পিঠ ব্যাথা ৪২%, পেটের ব্যাথা ৩৬%, গ্যাস্ট্রিক ৩০%, চর্মরোগ ২০% এবং অন্যান্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছেন।

১. বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি:

ক. গৃহস্থালীর বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে:

পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যতম শিকার হচ্ছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা। দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা সনাতন পদ্ধতিতে বর্জ্য অপসারণের কাজে নিয়োজিত। এটা অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়েছে যে, শুধু দলিতরা পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করবে। সারা দেশেই এই জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস এবং মূলত শহরবাসীর সৃষ্ট গৃহস্থালীর বর্জ্য তারা প্রতিদিন পরিষ্কার করছে। গৃহস্থালীর বর্জ্য বাসাবাড়ির নানা ধরনের জীবানু বহন করে থাকে। এই সকল কাজ তারা অধিকাংশক্ষেত্রেই সনাতনী পদ্ধতিতে করছে, ফলে আবর্জনা পরিষ্কার এবং বাছাইকালে অসতর্কতাবশত হাত ও পায়ের বিভিন্ন অংশ কেটে গিয়ে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে, তারা দীর্ঘদিনের জন্য অসুস্থ্য হয়ে পড়েন এমনকি হাত বা পায়ের অংশ বিশেষ কেটে বাদ দেয়া লাগে এর ফলে সেই ব্যাক্তিকে সারাজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়। পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তি পঙ্গুত্ব বরণ করলে প্রকারন্তে পরিবারটি পঙ্গু হয়ে পড়ে।

খ. রাস্তা ঝাড়ু দেয়া/পরিস্কার করা:

সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের শহরের রাস্তা পরিস্কার করতে হয় এবং এ কাজটি করতে হয় ভোর বেলায়। খুব ভোরে কাজে যাওয়ার সময় নিরাপত্তার অভাবের কারনে অনেক সময় ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে তাদের সাথে থাকা মোবাইল এবং টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়। ঐ সময়ে রাস্তায় বাস ট্রাকসহ অন্যান্য যানবাহন বেপরোয়াভাবে চলাচল করে, ফলে অনেক সময় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পরিছন্নতাকর্মীর প্রানহানী পর্যন্ত ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল দূর্ঘটনার কোন মামলা হয় না, মামলা হলেও তার সুষ্ঠু বিচার হয় না বা ভূক্তভোগী পরিবার ক্ষতিপূরণ পায় না। এছাড়া রাস্তা পরিস্কার কাজ করার ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে শরীরে ধূলাবালি এবং যানবাহনের ধোয়া প্রবেশ করার ফলে তাদের শ্বাসকষ্টসহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকেন গর্ভবতী নারীরা। কারণ এই কাজ গর্ভের সন্তানেরও স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও নারীরা বাসার বাইরে দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় কাজ করে, এসময়ে স্বাভাবিকভাবেই তাদের টয়লেট ব্যবহারের প্রয়োজন হয় কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক গণশৌচাগার না থাকায় চরম বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়।

গ.শহরাঞ্চলে স্যুয়ারেজ লাইন পরিষ্কার কাজে ঝুঁকি:

শহরাঞ্চলে স্যুয়ারেজ লাইন পরিষ্কারের কাজে যারা নিয়োজিত থাকেন তারাও চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভায় স্যুয়ারেজ লাইন হলেও এই সকল স্যুয়ারেজ লাইন পরিষ্কার করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি বা ব্যবস্থাপনা প্রচলন হয়নি। ফলে পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে স্যুয়ারেজ লাইনের মধ্যে নেমে পরিষ্কার করার কাজটি তাকে করতে হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্যুয়ারেজ লাইনে বুক সমান নোংরা পানির মধ্যে তাদেরকে কাজ করতে হয়। বর্ষার সময় স্যুয়ারেজ লাইনে অতিরিক্ত স্রোত তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এরকম ঘটনার হতাহতের কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও চরম ঝুঁকি থেকে যায়। শহরাঞ্চলে স্যুয়ারেজ লাইন পরিষ্কারের কাজে যারা নিয়োজিত থাকেন তাদের বেশিরভাগই শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় ভোগেন। সনাতন পদ্ধতিতে মানব বর্জ্য অপসারণের কাজে নিয়োজিত যারা তাদের বেশিরভাগ শ্বাস তন্ত্রের সমস্যা এবং চর্মরোগে ভুগে থাকেন।

ঘ.মনুষ্য বর্জ্য অপসারনে ঝুঁকি:

বাংলাদেশের মফস্বল শহরে এখনও উন্মুক্ত টয়লেটের প্রচলন রয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর টয়লেটের ট্যাংকি ভর্তি হয়ে যাবার ফলে সেগুলো খালি করার প্রয়োজন হয়। এই টয়লেট পরিষ্কার করার কাজটি যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় করে আসছে দলিত জনগোষ্ঠী। এ যেন অলিখিত এক নিয়ম, কাজটি তাদেরই করতে হবে। এই কাজে দলিত কর্মীরা হাতে-পায়ে-মুখে কোনো ধরনের সুরক্ষা ছাড়াই নিজের হাত ব্যবহার করে মনুষ্য বর্জ্য অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনার কাজটি করে থাকেন। পরিচ্ছন্নতা কাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হলো সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করা। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলী গ্রামে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় বাবা-ছেলের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে (তথ্যসুত্র: দৈনিক সংবাদ-১৭ আগষ্ট,২০২১)। সেপটিক ট্যাংক বন্ধ থাকার ফলে ভিতরে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হয়। এই গ্যাস নাক এবং মুখের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে মানুষের মৃত্যু ঘটায়। যারা মনুষ্য বর্জ্য পরিষ্কারের কাজ করছে তাদের বেশিরভাগই সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মী নন, এদেরকে মূলত মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হয়।

ঙ. মৃতপ্রাণী অপসারনে ঝুঁকি:

শহরের মৃতপ্রাণী অপসারনের কাজ দলিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীকেই করতে হয়। শহরের ড্রেনে, গর্তে বা রাস্তায় বিভিন্ন প্রাণী মরে পড়ে থাকে, অনেক সময় সেগুলো কয়েকদিন যাবৎ পড়ে থাকে তখন সেই মৃতপ্রাণী পচে যায়, কখন গলিত কিংবা অর্ধগলিত অবস্থায় থাকে, সঠিক সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়া সেটি অপসারণ করতে গেলে দূর্গন্ধ শরীরে প্রবেশ করে পেটের পীড়াসহ নানা ধরনের শারীরিক সমস্যায় ভুগে থাকে।

চ. মেডিকেল বর্জ্য অপসারণে ঝুঁকি:

মেডিকেল বর্জ্য সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। মেডিকেল বর্জ্য অপসারণ করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত পরিচ্ছন্নতা কর্মী প্রয়োজন হয় কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিচ্ছন্নতা কর্মীই এই প্রশিক্ষণ পায় না ফলে মেডিকেল বর্জ্য হাসপাতাল বা ক্লিনিক থেকে গাড়িতে উঠানোর সময় সিরিঞ্জের সুচ, ব্যান্ডেজ, রক্ত, পরিত্যক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গায়ে লেগে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর ক্ষত বা সংক্রমন হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই সংক্রমনের ফলে তার নিজের শরীরে দূরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাধে।

ছ. মর্গে কাজ করার ঝুঁকি:

মৃতব্যক্তি যদি কোন সংক্রমন রোগে আক্রান্ত থাকে তাহলে সঠিক সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়া সেই মৃতদেহের সুরতহাল করার সময় তা নিজ শরীরে সংক্রমিত হতে পারে যা তাকে মৃত্যু ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। বাংলাদেশে জেলা পর্যায়ের সকল হাসপাতালে মর্গ আছে এবং মর্গে কাজ করার বিধি বিধান আছে কিন্তু বাস্তবতা হলো মর্গে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয় না।

২.স্বাস্থ্য নিরাপত্তা :

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আইনি বিধি-বিধান:

সুস্বাস্থ্য এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা আজ মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকরী

উদ্যোগের অভাব এই সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমনীতি-২০১২ এর মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে, 'শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে অধিকার সুরক্ষা, শোভন কর্মপরিবেশ ও সুস্থ শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।...সর্বস্তরের জনগণের মানসম্মত জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংস্থান এবং সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এরই প্রেক্ষাপটে সরকার এমন একটি ইতিবাচক, বাস্তবমুখী ও ন্যায়সংগত নীতি অনুসরণ করতে চায় যার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর নায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি শ্রমিকরাও আন্তরিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করবে'।

এছাড়াও এই নীতির উদ্দেশ্য ৪.০২.৮-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও অন্যান্য সম্প্রদায়, দলিত, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং ভাসমান মানুষসহ প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ'। শ্রমনীতির এতো সুন্দর কথ ামালা কোনো বাস্তবিক প্রয়োগ না থাকার কারণে দলিতসহ অনেক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। তারপরও আশার কথা হলো, এই নীতিতে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ তৈরির তাগিদ রয়েছে।

জাতীয় শ্রমনীতির ১০ নং অনুচ্ছেদে শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির বিষয়ে বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'শ্রমিকের কর্মস্থলে এবং শ্রমঘন আবাসিক এলাকায় সরকারি-বেসরকারি, ব্যক্তি ও যৌথ উদ্যোগে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্য বীমা স্কীম চালু এবং স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে'। অন্যদিকে, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল উদ্দেশ্য-এর দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে, 'জনসাধারণ, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন এবং সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা'। এখন প্রয়োজন সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের সদিচ্ছা। শ্রমনীতি ও স্বাস্থ্যনীতির এই ঘোষণা অনতিবিলম্বে দলিত কমিউনিটি ও কলোনীতে বসবাসকারীদের জন্য সুস্বাস্থ্যের বার্তা বয়ে আনবে- এটিই প্রত্যাশা।

৩.কোভিড-১৯ দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি:

ঢাকাসহ বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন অধীনে এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল, শপিংমলে কর্মরত দলিত কর্মীরা স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, গামবুট, এ্যাফরন, হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রদান ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু পরিছন্নতা কর্মীরা এ সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমন শনাক্ত হওয়ার পর ঢাকা সিটিকর্পোরেশন থেকে পরিছন্নতা কর্মীদের মধ্যে সীমিত পর্যায়ে কেবলমাত্র মাক্স ও হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ করা হয়। বেসরকারি কর্তৃপক্ষ দলিত পরিছন্নতা কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোন উপকরণ বিতরণ করে নাই তাই শহরের পরিছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ঢাকা সিটিকর্পোরেশনের অধিকাংশ দলিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা নির্দিষ্ট কলোনীগুলোতে বসাবাস করে। ১০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১২ ফুট প্রস্থ একটি ঘরে গড়ে ৬ থেকে ৮জন মানুষ বসাবাস করে। (সূত্র-সরজমিন পরিদর্শন) তাদের বিশুদ্ধ পানি ও পয়:নিষ্কাষন ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। কলোনীগুলোতে বসবাসরত জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী। দলিত পরিছন্নতা কর্মীরা কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তার জন্য হোম কোয়ারাইন্টাইন নিরাপদ নয় কারণ তারা একটি রুমের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে বসবাস করছে ফলে এই ভাইরাসটি অতি দ্রুত অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভবনা রয়েছে। করোনা মহামারিকালে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকে দলিতরাই পরিচ্ছন্নতার কাজ করেছে এবং এখন করছে। এর মধ্যে অনেক হাসপাতাল আছে যেখানে শুধু করোনা রোগীদের চিকিৎসা করা হয় সেখানেও পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দলিতরা ফলে তাদের কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশী। গৃহবর্জ্য অপসারণ করার ক্ষেত্রেও তাদের করোনা ঝুঁকি রয়েছে। কোভিডে আক্রান্ত পরিবারের গৃহবর্জ্য অপসারণ করার সময় তাদের মধ্যে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪. দলিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আর্থ-সামাজিক অধিকার :

বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠী শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা আজ মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকরী উদ্যোগের অভাব এই সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। যেসকল দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মী পেশাগত কারণে জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়, অঙ্গহানী বা পঙ্গুত্ব বরণ করে প্রকারান্তে তার পরিবারটিও আর্থিকভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। একজন পরিচ্ছন্নকর্মীর মাসিক গড় আয় প্রায় ৪ হাজার টাকার কিছু বেশী, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর আয় ২ হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা যা দিয়ে ৮-১০ জনের একটি পরিবারের ভরণপোষণ করতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগতে থাকা এই পরিচ্ছন্নতাকর্মী চিকিৎসার জন্য আয়ের একটা বড় অংশ ব্যয় করেন। নিকটস্থ ফার্মেসি থেকে কোনো প্রকার ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়াই তারা কম দামে ঔষধ কিনে তা সেবন করেন। ফলে তারা শারীরিক বিভিন্ন জটিলতায় ভোগেন, কোনো কোনো সময় শরীরে দানা বাঁধে মরণব্যাধি। এভাবেই তারা নিজেদের শ্রম ও কর্মের মাধ্যমে সমাজের উঁচু জাতের মানুষদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছেন, কিন্তু তাদেরকেই দূষিত সিটি কর্পোরেশন থেকে নিয়মিত ও যথেষ্ট ও অস্পৃশ্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সমস্যা সমাধানে সুপারিশ সমূহ:

১. পরিমানে মানসম্মত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী যেমন, হ্যান্ড গ্লাভস, গাম বুট, রেইকোট/ছাতা এবং মাস্ক সরবরাহ করা।

২. সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে দলিত কলোনীগুলোর কাছাকাছি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা যাতে খুব সহজে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারে।

৩. পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা চালু করা যাতে পেশাগত কারণে স্বাস্থ্য সমস্যা, অঙ্গহানী ঘটলে বা মৃত্যুবরণ করলে ক্ষতিপূরন পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

৪. সনাতন পদ্ধতিতে বর্জ্য অপসারন নিষিদ্ধ করে কর্মক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য আধুনিক উপকরণ সরবরাহ করা।

৫. দলিত নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

৬. গৃহবর্জ্য অপসারণের সনাতন পদ্ধতির বিলুপ্তি সাধনে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৭. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।

৮. কর্মক্ষেত্রে দলিত নারীদের নিরাপত্তা ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৯. বাংলাদেশে দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনা করে বিদ্যমান সমস্যা উত্তরণে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০. আউটসোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের চাকুরী স্থায়ী করা।

তথ্যসূত্র:

১.জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি- ২০১১, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.জাতীয় শ্রম নীতি- ২০১২, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩.পারভেজ, আলতাফ ও মাজহারুল ইসলাম; বাংলাদেশের দলিত সমাজ : বৈষম্য, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতা; অক্টোবর ২০১৪; নাগরিক উদ্যোগ ও বিডিইআরএম।

৪.A Study on Occupation Health & Safety of Dalit's in Bangladesh-2013, by Nagorik Uddyog & Safety and Rights Society.

৫. Manual Scanvenging: An Inhuman Occupation, by Zakir Hossain, Abul Basar & B.David Raju, Nagorik Uddyog.

নাগরিক উদ্যোগ-ত্রৈমাসিক। বর্ষ: ১১, সংখ্যা: ৩য়, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২। রেজি. নং: জে:প্র:ঢা/রেজি:৫৫/১২।